ডোভার পেরিয়ে



ডোভার পেরিয়ে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ :
অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদপট মুদ্রক :
ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২৬ ক্রিসটোফার রোড
কলিকাতা ১৪

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক : শ্রীসুনীল দাস
স্টুডিওগ্রাফিক
পি ১২ মিশন রো এক্সটেনশন
কলিকাতা ১

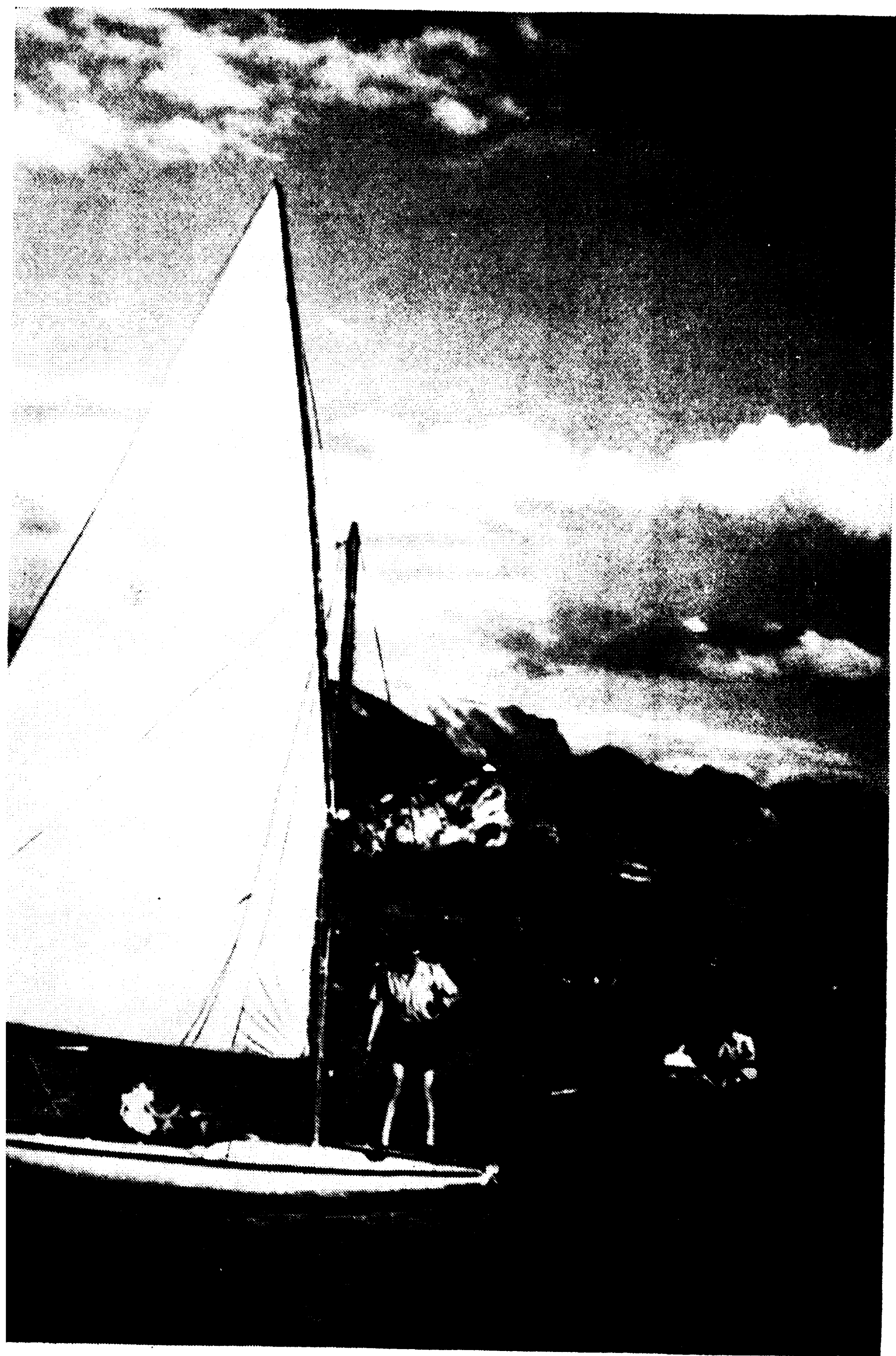
বাঁধিয়েছেন :
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওআর্কস
৬১/১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মূল্য : ৪.৫০

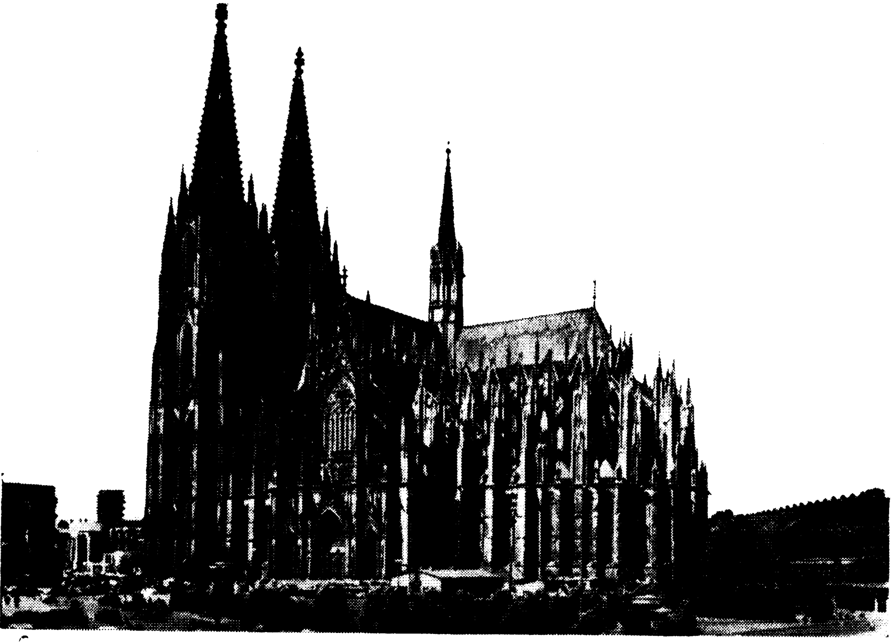
ডোভার পেরিয়ে

রচনাস্থান : ইওরোপ

কাল : ১৯৫৫



অমল ধবল পালে লেগেছে··· : জুরিখ



একটি বিখ্যাত ক্যাথিড্রল : কোলন



আসনতলের মাটির 'পরে : সেণ্ট জেকব



হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী : জার্মানি



স্বপন-পারের ডাক শুনেছি : রোন

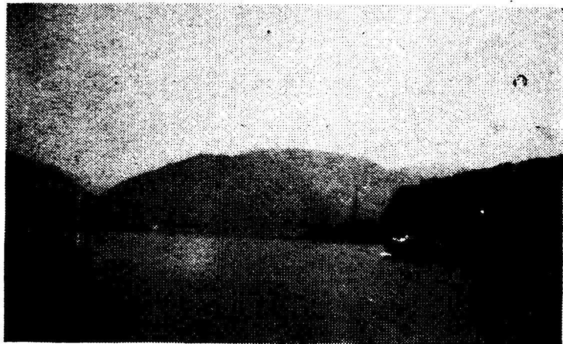


সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে : বেলজিয়াম



আঁধার রজনী পোহালো—সুইটজারল্যাণ্ড

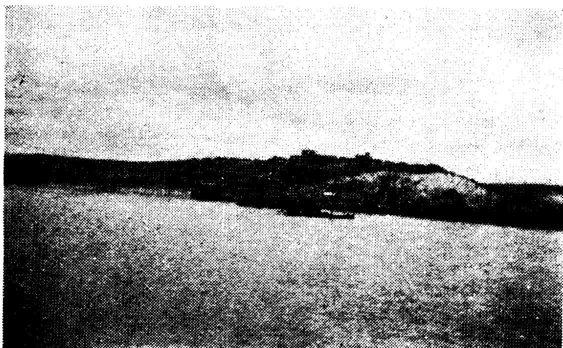
আলোকের ঝরনাধারায় হাইড পার্ক : লণ্ডন



রাইন নদী : বপার্ড



রাত্রি এসে যেথায় মেশে : বপার্ড



ডোভারের একাংশ



সকালের হ্রদ : হোটেলের জানালা থেকে



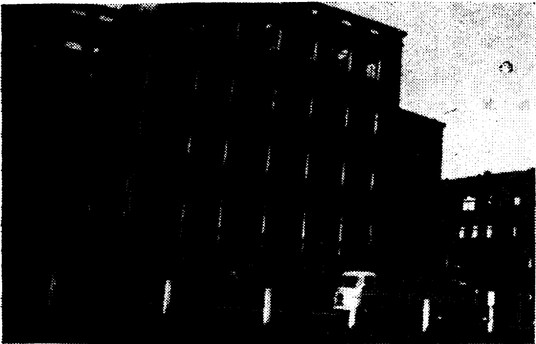
দলের কয়েকজন : কন্‌স হোটেল, লাক্সেমবার্গ



জলপ্রপাত



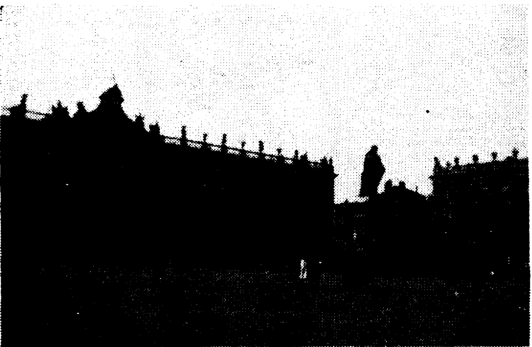
ইন্‌সব্রুক



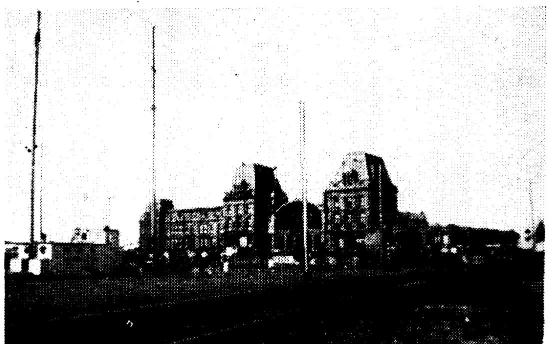
ভগ্ন, ক্ষতবিক্ষত—হের হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স



খালের সেতুতে দণ্ডায়মান লেখক : লুসার্ন



প্রাসাদমালা : নান্সি



রেল-স্টেশন সৌধ : অস্টেণ্ড

সকাল সাড়ে পাঁচটায় শচীনদা আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিলেন।

শচীনদা অর্থে শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করছেন। বিষয়—প্রাচীন ইতিহাস। তিনি আমার রুমমেট। সকালে ওঠা তাঁর বরাবরের অভ্যাস।

স্নান নয়। মাথায় একটু জল চাপড়ে সাজগোজ সেরে নিলাম। পরলাম 'বার্টনের' তৈরি নূতন স্যুট। গতকাল এনেছি।

আগের দিন রাত্রে ব্যাগে আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভরে রেখেছিলাম। একটা গোটা কেক কিনে রেখেছিলাম—সকালে খেয়ে বেরোবার জন্য। নইলে, কে অত সকালে ব্রেকফাস্ট দেবে? কেক খানিকটা খেলাম। জল খেলাম। নিলাম—ব্যাগ, ক্যামেরা।

তারপর যাত্রা করলাম বাসা থেকে। শচীনদাও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তুলে দিয়ে আসবেন আমাকে দলের কোচে।

সকালটা ভালো। জলবৃষ্টি নেই। একটু কুয়াশা শুধু। তখনো রোদ ওঠেনি।

একটা ট্যাক্সি নিতে হল।

গিয়ে পৌঁছলাম ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশনে সাতটা নাগাদ। আমাদের গাড়ি কোথায়, খুঁজতে লাগলাম। গাড়ি তখনো আসেনি।

সেই মাত্র একটা চায়ের দোকান দরজা খুলল। অমনি লাইন লেগে গেল। আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। শচীনদা দাঁড়ালেন না।

গাড়ি যখন এল, তখনো আমার সঙ্গীরা সকলে আসেনি। একটি-মাত্র ইংরেজ-দম্পতি এসে শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দলটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন যে কোম্পানী, তাঁর নাম ব্রডওয়েস্। শারউড স্ট্রীট, লণ্ডন, ডব্লু-১।

দেখতে দেখতে সকলেই এল। লাইন লাগাল। মাল বোঝাই হতে লাগল বাসের পিছনে।

তারপর যাত্রা শুরু হল। সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটে বাস ছাড়বার কথা। ছাড়ল প্রায় আটটার সময়। তখন রোদ উঠে গিয়েছে।

দলে আমরা সবসুদ্ধ তেরোজন। ছ'জন পুরুষ, সাতজন স্ত্রীলোক।

পুরুষদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—পিটার সাণ্টার, ই বেথেল, এ রবার্টসন, এফ জি মিচেল। মেয়েদের মধ্যে : মিস এম এ কটন, মিস বি সি জোন্‌স্‌, মিসেস জে আর জেবসন, মিসেস জে ক্যানাডি, মিসেস এ রবার্টসন ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই ইংরেজ। সকলেই লাল টকটকে। তার মধ্যে আমি শুধু এক ভারতীয়। এক কালো।

যে তুলনায় বাসটা বড়, সে তুলনায় মানুষ খুবই কম। গদি-মোড়া সুন্দর সুখাসন। হেসে-খেলে যে যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে। আমি বসেছিলাম জানালার ধারে। এ দেশের বাসগুলো এমনভাবে তৈরি যে চট করে ভিতরে ঠাণ্ডা আসে না। চারিধার বন্ধ কাঁচ দিয়ে।. অথচ আলো আসায় বাধা নেই।

আলফ্রেড বার্স্টিন (Tour manager and interpreter) আমাদের কোরিয়ার দাঁড়িয়ে উঠে খানিকটা বক্তৃতা দিলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ। খুব কৌতুকপ্রিয়। সকলের নামের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

উঁচু-নিচু পথ অতিক্রম করতে করতে আমাদের বাস এসে বেলা দশটা নাগাদ এক জায়গায় দাঁড়াল। সেখানে জেণ্টেলম্যানদের জন্য ঘর আছে। চা ও খাবারের দোকান আছে।

আলফ্রেড বললেন, সকলে নামো। চা খেয়ে এসো।

সকলকে নামিয়ে বাসের দরজায় চাবি দিয়ে তিনি বিয়ার খেতে চলে গেলেন।

আমাদের দেশে বিধবা মেয়েরা যেমন একজনের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রা করে, আমরাও ঠিক সেই ধরনের তীর্থযাত্রী। আলফ্রেড হচ্ছেন আমাদের কর্ণধার, আমাদের নেতা। এ দেশে তীর্থযাত্রা হচ্ছে এইটেই। চলো জার্মানি, চলো নরওয়ে, চলো চেকোস্লোভাকিয়া। একবার গরম-কাল এলে আর রক্ষে নেই, তীর্থযাত্রার হিড়িক পড়ে যায়। আত্মার মোক্ষ এদের কাম্য নয়। চক্ষুর চরিতার্থতাই এদের বিলাস। কোথাও কোনো দেবতার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়া নয়। অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের পথে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার আত্ম-চেতনা। মিসেস জে ক্যানাডি যুবতী নয়। একটি বৃদ্ধা রমণী। নাক দিয়ে তার সময় সময় রক্ত পড়ে। অথচ তাকেও আসতে হয়েছে তীর্থদেবতার এই একান্ত এষণায়। দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

পনেরো মিনিটকাল চা-কফি-স্যাণ্ডুইচে সমর্পণ করার পর আবার বাসে চড়া হল।

"আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।"

বাস মাঠ-ময়দান, উঁচু জমি, নিচু জমি ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। ডোভারে এসে তার চাকার চাপল্য শান্ত হল।

আমরা পাসপোর্ট দেখাতে দেখাতে ডোভার স্টেশন অতিক্রম করতে লাগলাম। তখন বেলা বারোটা। স্তব্ধ, অন্ধকার হয়ে আছে স্টেশনের কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম।

উঠলাম চ্যানেল পার হবার জন্য স্টীমারে।

দেখতে দেখতে নানা দলের যাত্রীতে ভরে উঠল সেই স্টীমার। অজস্র চেয়ার ছিল। আমি আর পিটার—দুজনে দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ডেকের ধারে বসে গেলাম।

পিটারের সঙ্গে একটু একটু করে ভাব হল। বয়েস কুড়ি হবে। ইংরেজ যুবক। লাল টকটকে দেখতে। মাথার চুলগুলো বাদামী। কাজ করে নাকি কোন্ ছাপাখানায়। ককনি বলে তাকে মনে হল।

প্রথম তো কোনো কথাই তার বুঝতে পারি না। যা তা উচ্চারণ। ডেলিকে বলে ডাইলি। স্টেশনকে বলে স্ট্যাইশন। তারপর যখন বানান করে বলতে লাগল—আশ্বস্ত হলাম।

আমার কাছে কেকের ভুক্তাবশেষ বর্তমান ছিল। ছিল কয়েকটা চকোলেট। সে খেতে চায়নি। তবু তাকে জোর করে খাওয়ালাম।

সমুদ্রের ঢেউগুলি সূর্যরশ্মিতে ঝিকমিক করছে। বন্দরের বাড়ি আর অদূরের খড়ির পাহাড়টিকে ঘিরে এক অপূর্ব বিভূতি।

বাঁশি বাজিয়ে স্টীমার দুলে উঠল। নোঙর শিথিল হতে হতে কখন অদৃশ্য হল। সিঁড়ি উঠে এল ভিতরে। চাকার তলায় জাগল নীল জলের সফেন আলোড়ন।

আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দা ছুঁয়ে।

বহু যাত্রীর আনন্দ-কোলাহলে স্টীমার মুখর।

আরো তিনটি কালো যাত্রীর সহসা দর্শনলাভ ঘটল। একটি শাড়িপরা যুবতী, আর দুটি সাহেববেশী যুবক। যুবতীটি আমার পাশেই আসন গ্রহণ করলেন। আর কী উচ্চকিত হাসির শব্দ! হেসে কথা বলছেন তিনি আর একজন ইওরোপীয় মহিলার সঙ্গে।

জিগ্যেস করলাম, আপনি কি ভারতীয় ?

হ্যাঁ।

ভারতবর্ষের কোন্ জায়গা থেকে এসেছেন ?

দক্ষিণ ভারত থেকে।

বসে বসে ঘুম আসতে লাগল। সমুদ্রের মিষ্টি হাওয়ায় কার না ঘুম আসে ?

দুপুরে অন্যদিন লাঞ্চ খাওয়া হয়। আজ সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

স্টীমারের ভিতর কলা বিক্রি হচ্ছিল। পিটার তাই কিনে খাওয়াল।

প্রায় চার ঘণ্টার উপর স্টীমারে কাটাবার পর মাটি পেলাম। এলাম অস্টেণ্ডে। আবার পাসপোর্ট দেখাবার পালা।

অস্টেণ্ড স্টেশন-সৌধটি বাইরে থেকে দেখতে মন্দ নয়। ছোট শহর। ট্রাম গাড়ি আছে।

আমাদের এনে ফেলা হল মাঠের মতো একটা খোলা জায়গায়।

কোরিয়ার বললেন, আবার একটা বাস নেওয়া হবে। অপেক্ষা করো।

বাসওয়ালাদের সঙ্গে কি যে হল, মারামারি হবার জোগাড়।

আলফ্রেড একটা লোককে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী।

আমি, না তুমি ?—সেও চোখ রাঙায়।

আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট দল গড়ে উঠতে লাগল। সকলেই আলফ্রেডকে দোষারোপ করতে লাগল।—তোমার যদি এরকম কারবার, আগে আমাদের জানালে না কেন ?

আলফ্রেড বললেন, লেডিস এণ্ড জেন্টেলমেন, যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। এরকম যে হবে, আমি নিজেই জানতাম না। এখনি টেলিফোন করছি আমাদের কোম্পানীর গভর্নরকে—লণ্ডনে। আমার বিশ্বাস, তোমরা যা ভাবছ, তা নয়। তা হবে না। হতে পারে না।

একটা ছোট বাস জোগাড় হল।

আলফ্রেড বললেন, উঠে পড় সকলে। এতেই যাব।

উঠতে গিয়ে দেখা গেল সকলের জায়গা হয় না।

সঙ্গীরা বিরক্ত হল। আলফ্রেডের দিকে ক্রুদ্ধ নয়নে চাইতে লাগল।

নেমে পড়।

আলফ্রেড গত যুদ্ধে সৈন্য ছিলেন। বম্বে গিয়ে ভারতবর্ষ দেখে এসেছেন। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। বললেন, নেমে পড়। এ বাসে যাওয়া যায় না।

সকলে নেমে পড়ে পরিত্রাণ পেল।

চলো, চা খেয়ে আসি।

দলপতি আলফ্রেড আমাদের নিয়ে চায়ের দোকানে চললেন। হয়তো ভোলাবার জন্যই বিষয়টি। স্ট্র্যাণ্ড হোটেলে এসে সকলে মিলে জড় হলাম। কেউ চা, কেউ কফি, কেউ মদ।

একটি স্ত্রীলোক ছিল দোকানে। তারই দোকান। চোখ দুটো তার বাঘের মতো যেন জ্বলছে। পৃথিবী থেকে অনেক আঘাত না পেলে বুঝি চোখের চাহনি এরকম হয় না। আলফ্রেড তারই সঙ্গে শুরু করলেন সুখ-দুঃখের কথা। আলফ্রেডের মাথার উপর দায়। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। টেলিফোন-লাইন চাইলেন। লণ্ডনে টেলিফোন করলেন। যাকে খুঁজলেন, তাকে বোধ হয় পেলেন না।

চা বা কফির দাম অসম্ভব বেশি। মনে হল, এর চেয়ে লণ্ডনে ঢের সস্তা। প্রত্যেককে পয়সা দিতে হল নিজের নিজের ব্যাগ থেকে। এক কাপ চায়ের জন্য দিতে হল এ অধমকে—দু শিলিং।

আবার ফিরে এসে সেই মাঠে জড় হলাম।

মিসেস ক্যানাডি চকোলেট খাওয়াল। মিচেল ও বেথেল ছবি তুলল কয়েকখানা। আমিই বা বাদ যাই কেন? আমাকেও ক্যামেরা ধরতে হল।

ইতিমধ্যে আলফ্রেডের সঙ্গে সেই বাসওয়ালার কী কথা হল, কে জানে। সহসা একটা সুন্দর বাস এসে গেল।

আমরা উঠে পড়লাম তাতে। পাশ দিয়ে দুখানা ফেটিং চলে গেল। শুরু হল, কীপ টু দি রাইট···

আলফ্রেড বলতে লাগলেন : হ্যাভ এ গুড্ জব!

এটা তাঁর মুদ্রাদোষ। যখন-তখন এ কথা বলতে পারলে আর তিনি কিছু চাইতেন না। ফের বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন : লেডিস এণ্ড জেণ্টেলমেন, যা হয়ে গেল তার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমি বলেছিলাম কিনা, যার শেষ ভালো, তার সব ভালো! তোমরা শেষ

পর্যন্ত দেখবে, আমি তোমাদের জন্যে কী করি। আজ রাত্রেই ফের ফোন করব লণ্ডনে। গভর্নরকে আনাব। আমাকে বাসওয়ালা যেভাবে অপমান করেছে, তার বিহিত করব।

বাস সোঁ সোঁ শব্দে এগিয়ে যেতে লাগল।

বেথেল সিগারেট বিতরণ করতে লাগল।

আমি ছাড়া, সকলে গান গাইতে লাগল। গানের ভাষা অবশ্য ইংরেজী। সুরটা কানে ভালোই লাগল।

মিঃ ও মিসেস রবার্টসনের সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। বয়েস সাত-আট বছর হবে।

মাঝে মাঝে সে এমন দুষ্টুমি করছিল যে তাকে মিঃ রবার্টসন না মেরে পারল না। আবার, এমনও হয়েছে, ছেলেটা মায়ের কোলে উঠে মাকে চুমু খেতে শুরু করেছে বারংবার।

ব্রুগেস আর ঘেণ্ট-এর অতি প্রাচীন নগরী পার হয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলল। কোথাও পাইন গাছের বন ও মেষচারণ ক্ষেত্র। রাই-বীট-গম-তামাক ও আঙুর বাগানের বিস্তৃতি। কোথাও বা ছোট ছোট খাল। সমুদ্রতীর থেকে প্রসারিত সুদীর্ঘ বাঁধ। কাঁচ ও রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রীর কারখানা। পশম-বয়নশিল্পের অঞ্চল। সুন্দর জনপদ···বাগিচা।

পথ যেন আর ফুরোতে চায় না।···পথের দুপাশে নিগূঢ় অন্ধকার।

রাত্রি নটা বেজে গেল অথচ হোটেল এল না।

সাঁই সাঁই শব্দে বাস এগিয়ে যেতে লাগল।

যখন রাত্রি সাড়ে নটা, দেখা দিল সুন্দর শহর। আলোকমালায় ঝলমল করছে শহরের হোটেলগুলি। শহরের দোকান, শহরের ট্রাম।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্স একটি বিখ্যাত শহর।

আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেল কসমোপোলিটে এসে নীত হলাম।

আলফ্রেড বললেন, যার যার মাল যথাসময়ে ঘরে গিয়ে পৌঁছবে।

তোমরা আপাতত ডিনারে বসে যাও। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমি ফোন করতে যাচ্ছি।

ডিনার টেবিলে বসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতার কোনো সাহেব হোটেলে এ অধমের যাবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে হয়নি। জানি না, সে-সব হোটেলের কি বৈশিষ্ট্য। এখানে যা দেখলাম, তাই বলি।

খাবার টেবিলের উপর সুন্দর ত্বখানা শাদা টেবিল-ক্লথ। কাঁচের এস-ট্রে। প্রত্যেকের জন্য তিনটে পরিচ্ছন্ন চকচকে কাঁটা। একটা বড় চামচে। একটা ছোট। বড়টায় করে স্যুপ খেতে হয়। ছোটটায় আইসক্রীম। তুটো করে ছুরি। শিশিতে নুন, মরিচ। দাঁতে দেবার কাঠি। একটা করে কাগজের রুমাল। রুমাল কোলে পেতে বসতে হয়। পাছে খেতে গিয়ে কিছু পড়ে কোলের উপর, জামাকাপড় নষ্ট হয়, তারই জন্য এই সতর্কতা! ফের সেই রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলা চলবে। একটি ফুলদানি। তাতে সুশ্রী কয়েকটি ফুলের স্তবক। কে জানে সে-ফুল সুইট-পী, কি এস্টার! একটা ডিশে চারজনের জন্য চারখানা গোটা রুটি। ছোট ছোট চারটে মদের গেলাস।

পান বলতে জল-পান নয়। মদ-পান। এটা হোটেলওয়ালাদের উপরি লাভ। যদি কেউ জল চায়, অনেক হোটেল অবশ্য দেয়। কিন্তু মনে মনে খুশি হয় না। মদ দিতে পারলে এদের আনন্দ হয়। তাতে কিছু লাভ থাকে।

ইংলণ্ডের লোকেরা খুব বেশি মদের পক্ষপাতী—মনে হল না। অনেকেই জল চাইল। প্রথমত হয়তো খরচের ভয়ে। দ্বিতীয়ত জলে তাদের অব্যর্থ তৃপ্তি।

আমিও জল চাইলাম।

একের পর এক ডিশ শেষ করলাম। সমস্ত হোটেলটা ভরে গিয়েছে ভ্রমণকারীদের ভিড়ে। হোটেলের মালিকরা জার্মান ভাষায়

কথা বলে। কাজেই ইংরেজী যেটুকু বোঝে বা জানে—সে শুধু ব্যবসার খাতিরে। ঝলমল করছে মাথার উপর আলোর ঝাড়বাতি। মেয়ে ও পুরুষ নানা জায়গা থেকে এসেছে। সকলেই ইওরোপীয়। সকলেরই গায়ের রঙ শাদা।

কিসের যে মাংস খেলাম, ভগবান জানেন। তবে পেট ভরল খুব।

আলফ্রেড হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, কাল সকাল সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট। আটটায় বেরিয়ে পড়তে হবে। চাবি নিয়ে যে-যার ঘরে চলে যাও।

লিফ্‌টের সাহায্যে তিনতলায় উঠে আমার ঘর পেলাম।

ঘর দেখে মাথা ঘুরে গেল।

ঘর বলতে কলকাতার এক গলির কথাই মনে আসে। রাস্তার পাশে একখানা ঘর। অগণিত জিনিসের স্তূপ। জিনিসের তুলনায় মানুষ তুচ্ছ। দেওয়ালের চুনবালি খসে গিয়েছে। কতদিন হোয়াইটওয়াস হয়নি ঘরটায়। বাড়িওয়ালার কাছে নালিশ করাও বাতুলতা। বাড়িওয়ালা বলবে, উঠে যেতে পার। তোমার ডবল ভাড়ায় ভাড়াটে পাব। ঘরে সোফা নেই, খাট নেই। শুধু কতকগুলো আবর্জনা!

আর এ কার ঘর? সুন্দর দুগ্ধফেননিভ শয্যা। তার উপর সোনালী চাদর। সাটিনের লেপ। মেঝেতে লাল কার্পেট। বেসিন। তাতে দুটো কল। একটা গরম, অপরটি ঠাণ্ডা জলের। সুন্দর আয়না। বিরাট আলমারি। আলমারির গায়ে আবার মানুষ-সমান আয়না। চেয়ার, টেবিল, জামা রাখবার হুক, তিনটে আলো। একটা বড় দেরাজ। অপরটি ছোট। তার উপর আবার টেলিফোনের রিসিভার!

ঘড়ি ছিল না কাছে। সকালে কেমন করে ঘুম ভাঙবে, ভাবনার বিষয় ছিল।

ঘুম না ভাঙতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো।

গুটেন মর্গন।

গুড্ মর্নিং।   হোয়াটস্ দি টাইম প্লীজ?

সাতটা বাজতে পনেরো মিনিট।

অশেষ ধন্যবাদ।

ব্রেকফাস্ট সারার পর আবার যাত্রা শুরু হল।

সুন্দর সকাল। গাড়ি যত এগোতে থাকে ততই নব নব দৃশ্য। পিচ ঢালা সুন্দর রাস্তা। পাশ দিয়ে মোটর-ট্রাক চলে গেল। কোথাও তুপাশে বন। মাঝখানে রাস্তা। সে-সব বনে কত রকমের গাছ! সিডার, বীচ, অ্যাশ, উইলো, পপলার। ছোট, বড়, মাঝারি—নানা রকমের সবুজ বনরাজি। দিগন্ত সীমানায় শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের চিত্রার্পিত রূপ।

কোথাও আপেল গাছে ধরেছে মঞ্জরী। ফলে আছে শত শত আপেল। আপেলের নামও অনেক। ডিলিসাস, জোনাথন, টমকিন, কাণ্টারি, কুইন। কোথাও নগর পার হচ্ছি। ট্রাম চলেছে। ট্রামে লেডি কনডাকটার। কোথাও বোমা ও বারুদের জ্বলন্ত স্বাক্ষর নিয়ে ভগ্ন, বিপর্যস্ত বাড়িগুলি গত যুদ্ধের অভিশাপ বহন করছে।

কোকাকোলার বিজ্ঞাপন—মোটর কারখানা—বালিগঞ্জের মতো প্রসারিত রাস্তা—কত যে দেখতে দেখতে পার হতে লাগলাম, হিসাব নেই।

লীজ পার হয়ে জার্মানিতে প্রবেশ করলাম। পাসপোর্টে ছাপ নিতে হল। Axi-La-Chapelle একটা দেখবার মতো জায়গা! কোলনের ক্যাথিড্রলের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। কী বিরাট আকারের এই সৌধটি! আর তার গায়ে কী অদ্ভুত ভাস্কর্য! চূড়া উঠে গিয়েছে আকাশের সীমানায়। চূড়ায় সূক্ষ্ম কারুকার্য। আশেপাশে অসংখ্য ফুলগাছ। সামনের চওড়া রাস্তায় মোটরের কী ভিড়!

ফল বিক্রি হচ্ছে। মেয়েরা বিক্রেতা।

কতকগুলো মার্ক খরচ করে দশটা আপেল কিনে আনলাম। মেয়েদের ভিতর সেগুলি বিতরণ করে দিলাম। তারা তো খুব খুশি !

আলফ্রেডকেও একটা দিলাম। তিনি লাফিয়ে উঠলেন : হ্যাভ এ গুড্ জব ! বড় ভালো ছেলে তো তুমি !

'বন' পার হলাম। ছোট শহর।

তারপর রাইন নদী। দুদিকে পাহাড় চলে গিয়েছে—যতদূর দৃষ্টি যায়। মাঝখানে রাইন চলেছে ছবির মতো। বাস চলতে লাগল রাইনের ধার দিয়ে। বহু লোক রাইনের ধারে হাওয়া খাচ্ছে। আলাপ করছে। স্থানে-স্থানে যেন মেলা বসেছে। যেসব জায়গাগুলি নির্জন, সেখানে ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে। সবুজ ঘাসের উপর এই তাঁবু ফেলে কত লোক যে গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করতে আসে ! এই তাঁবুতে ছেলেমেয়েরা থাকে একসঙ্গে। গান করে। খায়। এ একটা অদ্ভুত জীবনোপভোগের নিদর্শন।

রাইন ছাড়িয়ে বপার্ডে এলাম।

পথে একটা হোটেলে লাঞ্চ খেতে হয়েছিল দুপুরবেলা। এখানে মেয়েই ম্যানেজার। মেয়েই পরিচালিকা। জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে লাগল.আলফ্রেডের সঙ্গে।

একটু জল চাইলাম। কিছুতেই দিল না।

বললে, জল আবার খায় নাকি ? জল খেতে নেই।

মিচেল আর বেথেল—দুজনে দু-ভাঁড় বিয়ার নিয়েছিল। তাদেরই এঁটো বিয়ার পিপাসায় পড়ে খেতে হল। আমার খাওয়ার পর বাকীটা অবশ্য তারাও খেল। কালো বলে তারা আমাকে অশ্রদ্ধা করেনি। বারবার সিগারেট জুগিয়ে গিয়েছে। যখন যা জিগ্যেস করেছি, সাধ্যমতো জবাব দিয়েছে।

মিচেল ব্রিটিশ নৌসেনাবাহিনীতে কাজ করেছে ১৯৪৪ সালে। গিয়েছিল মাদ্রাজ অবধি। ভারতবর্ষ বলতে সে বুঝে এসেছে—একটা গরিব দেশ। তাই বলে, সেইটেই তার শেষ ধারণা নয়।

দেখে এসেছে আশ্চর্য হয়ে হিন্দুস্থানের স্থাপত্যশিল্প, তার মন্দিরময় সংস্কৃতি, তার চিত্রময় ঐশ্বর্য। নির্মেঘ তাম্রদগ্ধ আকাশের নিচে খররৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের মহানগরী। তার বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয়ে সরল, গৌরবান্বিত জীবনের প্রস্ফুট পরিচয়।

বিকেল ছটা নাগাদ আমরা এসে পেলাম আমাদের নির্ধারিত হোটেল—কবলেঞ্জ-এ।

হোটেলের নাম : Hotel Hohenstan Fen, Koblenz।

একই বাড়িতে সকলের আবার জায়গা হয় না।

আমি আর পিটার চললাম অন্য বাড়িতে। ওখান থেকে মিনিট চারেকের পথ। পথ ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। মেঘলায় নয়—কুয়াশায়।

বড় রাস্তার মোড় পেরিয়ে হোটেলের আর-একটা শাখায় গিয়ে উঠলাম। ম্যানেজার ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন না। তিনি হের হিটলারের দেশের মানুষ। মাতৃভাষা তাঁর ইংরেজী নয়—জার্মান। আমাদের কথা তিনি বুঝলেন না, শুনলেনও না। আমাদের সঙ্গে একটি যুবক আসছিল স্যুটকেস হাতে নিয়ে। আমাদেরই স্যুটকেস। যুবকটি এই বড় হোটেলের বেয়ারা শ্রেণীভুক্ত। তার সঙ্গে ম্যানেজারের কি সব কথাবার্তা হল।

পুনরায় চললাম আমরা আর এক বাড়িতে। ফুটপথের ওপারে। এখানে অনবরত "keep to the right."—রাস্তা পার হবার সময় হুঁশিয়ার না হলে বিপদ। অবিশ্রান্ত মোটরের চলেছে আনাগোনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্দমনীয় বোমাবর্ষণের ফলে জার্মানির বিরাট বিরাট বাড়ি একদিকে যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তাদের সংস্কার সাধনের কাজও চলেছে পুরোদমে। রাস্তাঘাট বিরাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নূতন মডেলের মোটর চোখে পড়ে প্রচুর।

চোখে পড়ে কারখানার চিমনি। আশ্চর্য নয় চোখে পড়া—রাইন নদীর বাণিজ্য বন্দরে উন্মুখর কর্মজীবন।

সঙ্গের বেয়ারাটি সকৌতুকে আমাকে লক্ষ্য করছিল। কেন লক্ষ্য করছিল, জানি না। শাদার মধ্যে আমি কালো বলে? কে জানে!

অবশেষে সে আর থাকতে পারল না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আস্তে আস্তে সে আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কোথাকার লোক?

বললাম, ইণ্ডিয়ার।

নেহরুর দেশের?

নেহরুর নাম শুনে বুকটা আমার গর্বে ভরে উঠল। ভারতবর্ষ থেকে জার্মানি—কত হাজার মাইলের ব্যবধান। মধ্যে কত নিঃসীম জলপথ, মরুভূমি, বিশাল ভূখণ্ড। সাত সমুদ্র তের নদী ছাড়িয়েও এই জার্মানিতে এসে একটা সাধারণ লোকের মুখে পণ্ডিত নেহরুর নাম শুনব ভাবতে পারিনি।

সাগ্রহে বললাম, হ্যাঁ, নেহরুর দেশের। তুমি নেহরুর নাম শুনেছ তাহলে?

নেহরুর নাম কে না শুনেছে?—যুবক হোটেল-বয়টি বললে, সারা পৃথিবীর লোক নেহরুর নাম জানে। শুনেছে। আমি তো সামান্য লোক। আজ নেহরুর উপরই নির্ভর করছে বর্তমান পৃথিবীর সুখ-শান্তি। নেহরু দীর্ঘজীবী হোক।

বড় ভালো লাগল তার এই শুভেচ্ছা বাণী। তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

যুবকটি মুখের দিকে চেয়ে রইল। জিগ্যেস করলাম, আর কিছু বলবে?

কিছু যদি না মনে কর, আর একটা কথা বলতে পারি। যুবকটি বললে।

নির্ভয়ে বলো।

তোমাকে দেখতে মেয়েছেলের মতো!

হায় ভগবান। এ কি কথা শুনতে হল এ বিদেশীর মুখ থেকে?

ভাবলাম বলি, বাংলাদেশে আমরা—যারা কবিতা লিখি, সকলেই মেয়েছেলে। আসলে না হলেও—হাবভাবে! সেকথা আর বললাম না। তার সরলতার প্রশংসা করতেও ভুলে গেলাম।

সুন্দর একটি ঘরে রাত্রের জায়গা পেলাম। রাজকীয় বিলাস। দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় দুখানি ঘর। আমার আর পিটারের।

টয়লেট রুমে গিয়ে দেখি, আয়নার মতো ঝক্‌ঝক করছে কমোড। যেন এই মাত্র বসানো হয়েছে। ঝক্‌ঝক করছে জলের কল, পাইপ, বেসিন, আয়না। ইওরোপের অনেক হোটেলে থেকেছি। এমনটি যেন কোথাও নজরে পড়েনি। এদের রুচিদক্ষতাকে মনে মনে তারিফ না করে পারা গেল না।

ডিনারে যাবার আধঘণ্টা দেরি ছিল। ততক্ষণ আরাম করে গদিমোড়া চেয়ারে খানিকটা গড়িয়ে নিলাম। তারপর উঠে সাবান দিয়ে মুখ ধুলাম। নূতন একখানি সাবান হোটেল থেকে প্রতি বাসিন্দাকেই জোগান হয়। ঘরের ভিতরেই বেসিন। সুন্দর সুন্দর কাঁচের গেলাস। তোয়ালে, আয়না, কৌচ—কি নেই?

দুটো বিছানা এ ঘরে। অথচ আমি একা।

ডিনারে গিয়ে বসতেই আবার অন্য জগৎ। অন্য পরিবেশ।

আজকের ভোজ্যবস্তুর মধ্যে প্রধান ছিল ভাত আর মুরগির মাংস। আমাদের সঙ্গে বসেছিল মিঃ আর মিসেস রবার্টসন। আমাদেরই দলের লোক। হোটেলের অন্য বাড়িতে তারা স্থান পেয়েছিল।

মিঃ রবার্টসন বললে, তোমরা তো ভাত ভালোবাসো?

বললাম, হ্যাঁ, গরম দেশ। ভাত না খেলে আমাদের শরীর খারাপ হয়।

ইংলিশ খানা কেমন লাগে তোমার?

ভালোই লাগে।

তোমাদের ভারতীয় রান্নায় বড় বেশি মসলা থাকে। আমাদের রান্নায় থাকে না।

যে দেশে যা ব্যবস্থা!

ছুরিকাঁটা দিয়ে মুরগি খাওয়া ধাতে সইল না। ইংরেজদের সঙ্গে খেতে বসেছি। কি করব—ভাবছি। সহসা নজর পড়ল আলফ্রেডের প্রতি। আলফ্রেড দিব্যি হাতে করে সেদ্ধ মুরগির মাংস মুখে তুলে খেতে শুরু করেছেন। শুধু এক হাত নয়—ছুহাতই লাগিয়েছেন মুরগির সদ্‌ব্যবহারে। আমার ভালো লাগল না আর খেতে। আধ-খাওয়া অবস্থায় মুরগিটাকে পরিত্রাণ দিলাম।

ঘরে যেতে পারলে পেট ভরে জল খাওয়া যেত। সেখানে সুন্দর কাঁচের গেলাস, কলের জল। কিন্তু তা আর হল না। খাওয়ার পর জলের জন্য মনটা সত্যই কাতর হচ্ছিল। হোটেল জল দেয়নি।

পিটার বললে, চলো, আমি তোমায় জল খাওয়াব।

ছজনে মিলে শহর বেড়াতে চললাম। আমি, পিটার, মিচেল, বেথেল, আর এক দম্পতি। সকলেই আমাদের দলের লোক।

চমৎকার সব দোকান। এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দোকানের ভিতরে-বাইরে আলো জ্বলছে। কাঁচের গ্লাস-কেসে সজ্জিত নানা দ্রব্য-সামগ্রী। ইলেকট্রিক আলোয় সেগুলি ঝলমল করছে। খেলনা, লাক্সসাবান, মেয়েদের গহনা, ছেলেদের বন্দুক, বল, ক্যামেরা আরোও কত কি।

রাত্রি তখন নটা।

একটা বার-এ গিয়ে জড় হতে হল।

দোকানের মালিক বললে, উপরে নাচ-গান হচ্ছে। দোতলায় গিয়ে বসুন।

উপরে গিয়ে জমিয়ে বসলাম। আমাদের অলক্ষ্যে একটি ঘরে বাজনা বাজছিল। সুর চমৎকার। সেই সুরের তালে তালে দুটি মেয়ে আমাদের সামনে দিয়ে নেচে চলল। কখনও এগিয়ে আসে,

কখনও আড়ালে যায়। মেয়ে দুটিকে কেন কে জানে, সে রাত্রে খুব ভালো লাগল।

পিটার আমার জন্য লেমনেডের অর্ডার দিল। আমি ছাড়া বাকী সকলেই মদ নিল।

খানিক বাদেই বাজনার ঘরে আমরা জায়গা বদল করলাম। দুজন লোক বাজাচ্ছিল। আধো আলো আধো ছায়ায় তাদের মাঝে মাঝে নিজের দেশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। তফাৎ শুধু গায়ের চামড়াটার। সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ তৈরি করতে লাগলাম লেমনেড খেয়ে।

আবার নাচ শুরু হল। বলনাচ।

একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় সে নাচ সার্থক। বেশ ভালো লাগল।

রাত তখন এগারটা।

সকলে বসে রইল। আমি আর পিটার গুড নাইট জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

খুব ঘুম পাচ্ছিল। আগামী কাল ফের সকাল সকাল উঠতে হবে বিছানা ছেড়ে। কাজেই আর নয়।

পথে বেরিয়ে দেখি, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।···

রাত্রির নিভৃত অবসরে পরস্পর পরস্পরের কটিদেশ বেষ্টন করে চলেছে।

রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। দূরে দূরে নিয়ন আলোর দীর্ঘ ল্যাম্পপোস্টগুলি রাত্রির নির্বিকার সাক্ষী। কোন্ এক সবুজ নির্জন উদ্যান থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট কুসুমের স্বর্গীয় সৌগন্ধ। আর ওরা দুজন চলেছে। শুধু চলেছে নয়। ছেলেটি মেয়েটির বুকের উপর মুখ রাখবার চেষ্টা করছে।

আর সহসা···

সহসা এ কি দেখলাম?

জার্মানির আকাশে একখণ্ড তৃতীয়ার চাঁদ। চাঁদ নয়, যেন কাস্তে!

মনে হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যাবে। এই তারুণ্যও একদিন বার্ধক্যে পরিণত হবে। এই স্মৃতিশক্তিও একদিন ক্ষীণ হতে হতে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন, সেই উত্তরকালে কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, যুদ্ধোত্তর কবলেঞ্জ-এ কি দেখে এসেছ? কি তুমি পেয়েছ?

কি উত্তর দেব আমি?

আমি উত্তর দেব—জার্মানির কবলেঞ্জ-এর নৈশ নির্জন পথে দেখে এসেছি—একটি ছেলে ও মেয়ে। তারা নবযুগের পথিকৃৎ! আর পেয়েছি আকাশে একখণ্ড তৃতীয়ার চাঁদ!—চাঁদ নয়, যেন কাস্তে।

সকালে উঠে অনুভব করলাম, নিস্তব্ধ বাড়িখানায় শুধু আমরা দুজন ছিলাম না। আরও একজন ছিল। একটি অপরূপ লবঙ্গলতিকা। তরুণীটি বুরুশ দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে। কিন্তু এমনই নিঃশব্দ তার উপস্থিতি যে ঘুণাক্ষরেও আমরা তা জানতে পারিনি। কি, সে-ই জানতে দেয়নি।

ঘরের পাশে রাস্তা। এই প্রত্যূষেও মোটরের সশব্দ অস্তিত্ব-ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট করতে আর-এক হোটেলে গেলাম। দেখি, পরিবেশক মেয়ে এবং রীতিমতো সুশ্রী। ইংরেজ মেয়ে এমন কী সুন্দরী? তার চেয়েও সুন্দরী কনটিনেণ্টের মেয়েরা। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ। কোথাও রঙ মেখে নিজেকে ঢাকবার প্রয়াস নেই। অথচ এমন সরল যে, দেখলে অবাক হতে হয়। কথায় কথায় এরা বলছে, ইয়া ইয়া। ইয়েস-এর জার্মান প্রতিশব্দ—ইয়া। কথাটা ভারী ভালো লাগে এদের মুখে শুনতে।

আমাদের বাস ছাড়ল সকাল আটটা পনেরো-য়। কুয়াশায় ভরে আছে পথঘাট। কুড়ি হাত দূরের মানুষকে দেখতেও অসুবিধা হয়। রাইন নদীর উপর এমন জাল বিস্তার করেছে কুয়াশা যে, পাহাড় আর নদী—সব একাকার হয়ে আছে।

বিরাট, উত্তুঙ্গ সব পাহাড়। ধীরে ধীরে গলিয়ে দিতে লাগল কুয়াশাকে—সূর্য উঠে।

আমরা বোপার্ড ত্যাগ করে এগিয়ে চললাম রাইনের ধার দিয়ে। তীরে অগণিত ছেলেমেয়ে প্রমোদ ভ্রমণে রত। বোমা-বিধ্বস্ত বহু বাড়ির শোচনীয় স্মৃতিচিহ্ন এখনো অম্লান হয়ে আছে ইতস্তত। আমরা গাড়ি থামিয়ে একটা দোকানে এসে ঢুকলাম। কেনার কত জিনিসই যে রয়েছে! ইওরোপের প্রত্যেক হোটেল আর বড় দোকানে কার্ড পাওয়া যায়। ছবিওয়ালা কার্ড। সেসব কার্ড কিনে

অনেকে প্রিয়জনকে পাঠায়। ডাক টিকিট পাওয়া যায় ঐ সব দোকান থেকেই। দোকানের কর্মচারী মেয়েরা অদ্ভুত ভালো। চিঠি লিখে, টিকিট মেরে তাদের হাতে দিলে তারাই ডাকে ফেলে দেয়।

আবার এগিয়ে চললাম বাসে চড়ে।

কত যে খড়ের গাড়ি পাশ দিয়ে ধিকিধিকি চলেছে তার ঠিক নেই। কী চমৎকার সব কুঁড়েঘর, সুন্দর ছবির মতো বাগান। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কোথাও পাহাড়ের সার মালার মতো। কোথাও বিরাট স্তম্ভের প্রদর্শনী। কোথাও আপেল খেত। কোথাও চড়াই-উৎরাইয়ের চিত্রবৎ নৃত্যলীলা। ট্রাক চলেছে নিজের অহঙ্কার নিয়ে। টেলিফোনের তার চলে গিয়েছে দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে।

তুটি সাইকেল আরোহিণীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। পড়ে রইল পশ্চাতে কপি খেত, বিমান বন্দর, কারখানার অগণিত চিমনি। ভ্রমণকারীর দল পিঠে বুঁচকি ঝুলিয়ে খালি গায়ে সাইকেলে চলেছে। কোথাও মজুররা রেল-লাইন তৈরি করছে।

কত শহর, কত তুর্গ, কত দ্বীপ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। পার হলাম বিন্‌গেন, মাইনৎস, ডার্মস্টাট, আসফেনবুর্গ।

ভুর্ৎস্‌বুর্গ শহরে রেফ্রিজারেটারের দোকান আছে। রেল-স্টেশন আছে। জামা-জুতোর অনেক দোকান। ট্রাম লাইনে ট্রাম চলেছে অব্যাহত।

মাইনৎস-এর একটি মদের কারখানার কথা ভুলতে পারব না। এখানে আমরা নেমেছিলাম। প্রবেশপত্রের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হল। একটি যুবক এসে তাঁদের কারখানার ইতিহাস ব্যক্ত করতে লাগলেন ইংরেজী ভাষায়। শুধু ব্যক্ত নয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন কী প্রণালীতে মদ তৈরি হয়। কোথায় পচাই হয়, কোথায় স্পিরিট কীভাবে তুলে নিয়ে মদে পরিণত করা হয়। দক্ষিণ-কলকাতায় একটা ভাটিখানা দেখেছিলাম। এর সঙ্গে তার তুলনা! মেয়েরা কাজ করছে। এক সঙ্গে অসংখ্য

বোতলে মদ ঢালা হচ্ছে মেসিনের সাহায্যে। মেসিনের সাহায্যে বোতলের গায়ে লেভেল লাগান হচ্ছে। ছিপি আঁটা হচ্ছে। তারপর ঠাণ্ডা ঘরে স্তরে স্তরে হাজার হাজার বোতল সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। কী আশ্চর্য যান্ত্রিক কলাকৌশল। প্রায় সাততলার সমান মাটির তলাকার গভীরতা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে মাথা ঘোরে।

যুবকটি আমাকে ভারতীয় দেখে বড় খাতির করলেন।

যত দুপুর এগিয়ে আসে, ততই চোখে-মুখে টান পড়ে। পিপাসা বাড়ে। পিপাসার জল না পেলে করি কি?

মিস কটন এদিক দিয়ে যথার্থ দরদী। সে ফ্লাস্কে করে জল ভরে নিয়ে যেত। অনেকবার জল খাইয়ে তৃপ্তি দিয়েছে। মিসেস ক্যানাডি অনেকবার সিগারেট দিয়েছে। চকোলেট বিতরণ করেছে। মাথা ধরলে সুগন্ধি প্রলেপ দিয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটিও ভালো লাগল। চারিদিকে প্রশস্ত রাজপথ, বড় বড় বাড়ি, অফিস, ট্রাম, রেল-স্টেশন—সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর। একটি হোটেলে লাঞ্চ সারলাম। তারা একটি রবারের বল উপহার দিল। বলের গায়ে হোটেলের নাম—রয়েল।

ইউ এস আর্মি হেড কোয়ার্টার্স পার হলাম। পার হলাম বিরাট পার্বত্য অঞ্চল, খেতখামার, অগণিত হোটেল।

এক জায়গায় এসে আমাদের বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। চাকায় কি হয়েছিল, ড্রাইভার নেমে দেখতে গেল।

সামনেই একটি চাষীর বাড়ি। আলফ্রেড গেলেন জল আনতে দুটো ফ্লাস্ক নিয়ে। একটি স্ত্রীলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল। তাকে বলতেই সে সযত্নে ফ্লাস্ক দুটো গ্রহণ করল।

এর পর আমরা ঢুকলাম একটা চায়ের দোকানে। চায়ের দোকান বলতে শুধু চা নয়। চা-কফি-মদ। যার যা ইচ্ছে সে তাই আদেশ করল। আমি চাইলাম কফি।

কিন্তু তার আগে জল চাই। ভয়ানক পিপাসা। ঘামে কপাল ভরে গিয়েছে।

মা আর মেয়ে মিলে দোকান চালায়। ওরা জার্মান ভাষায় কথা বলে। দোভাষী আলফ্রেডকে বললাম, জলের কথা বল।

আলফ্রেড আদেশ করতেই মেয়েটি এক গেলাস জল দিয়ে গেল। ভারী ভালো লাগল মেয়েটিকে। আমাদের গাঁ-দেশের মেয়ের মতো। সে-মেয়ে কালো আর এ-মেয়ে শাদা—এই তফাত। সরলতা-মাখা এমন সলজ্জ চাহনি—ইওরোপে কোনো মেয়ের কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি। মেয়েটির হাঁটু পর্যন্ত পা দুখানি সস্তা মোজা দিয়ে ঢাকা। মাথায় ছোট্ট একটু বিনুনি। আমার দিকে সে অবাক চোখে বার-বার চাইতে লাগল। হয়তো বোঝবার চেষ্টা করছে, এ কোন্ দেশী মানুষ? কেন এর গায়ের রঙ এমন। তার চোখের সেই ভীরু চাহনি কোনোদিন ভোলবার নয়। ন্যুর্নবার্গের পথে ন' বছরের এই মেয়েটি সত্যিই আমার মনে ছাপ রেখে গিয়েছে।

আরও এক গেলাস জলের দরকার ছিল। এবার নিজে গিয়ে কল খুলে জল নিলাম।

আমার সঙ্গীরা পরিহাস করল, তুমি কফি নিয়েছ, আবার জলও খাবে?

বললাম, আমরা জল খেতেই ভালোবাসি!

হোটেল থেকে যখন বেরোলাম—মা ও মেয়ে এগিয়ে এল। তাদের এই আতিথ্যপরায়ণ রূপটি সত্যিই বড় সুমধুর। কে কোথাকার লোক! যখন হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, এই মা-মেয়েকেই প্ররোচনা নিতে হয়েছিল, ইংরেজ শত্রু। অথচ আজ তারা এদের আত্মীয়ের মতো বিদায় দিচ্ছে!

আমি জার্মান ভাষা জানতাম না। তাতে কি। মনের আদান-প্রদানে ভাষাটাই কী সব? কপালে হাত ঠেকিয়ে মা ও মেয়েকে নমস্কার জানালাম।

আবার এগোতে লাগলাম। হুহু করে বাস ছুটছে।

গ্রাম্য পরিবেশ। পথে আলো নেই। তাই বলে পথ কাঁচা নয়। শুধু ইঞ্জিনের হেড লাইট বাসের চোখের কাজ করে যাচ্ছে। পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। সমতল পথ পার্বত্য প্রদেশে কোথায় পাই? চারিধার অন্ধকার। সহসা দেখা দিল ন্যূর্নবার্গ শহর। চারিদিকে আলোর উৎসব। আমেরিকান কলোনি। সুন্দর রাস্তা। বিরাট রেল-স্টেশন। অগণিত মোটর। অনেক ট্রাম। রাত সাড়ে নটায় আমাদের নির্ধারিত হেটেলে গিয়ে উঠলাম। নাম Hotel Deutscher Hof, Nürnberg.

ঘরে যাবার আগেই খেতে বসতে হল। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। হোটেল-কর্মচারীরা আর অপেক্ষা করতে পারে না।

ঘরে গিয়ে জানালা খোলবার চেষ্টা করলাম। বেশ গরম। দিব্যি জানালা খুলে শোয়া চলে। খুলতে গিয়ে দেখি, অনেক বাধা। পর্দা আছে। জানালা বন্ধ করবার সুইচ আছে। খড়খড়ি আছে। অত হাঙ্গামা না বাড়িয়ে অমনি ছেড়ে দিলাম।

জানালা বন্ধ থাকলেও বাইরে থেকে ট্রামের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। ঘরে আসবাবপত্রের কোনো দৈন্য নেই। প্রথম শ্রেণীর হোটেল। সুন্দর আলো। উত্তম ব্যবস্থা।

এ ঘরের নূতনত্ব দেখলাম, টেবিলের উপর লেখবার সরঞ্জাম। গোটা ছয়েক খাম আছে। গোটা আষ্টেক হোটেলের নাম-ছাপা কাগজ আছে। তার ফলে যে কোনোদিন চিঠি লেখে না, তারও ইচ্ছে করবে, দুখানা চিঠি লিখি। দেশে পাঠাই। দুটো বিদেশী ডাক টিকিটের সদ্ব্যবহার করি।

এমন ইচ্ছে আমারও হল। দুখানা চিঠি লিখে ফেললাম। এখন ডাক টিকিটের প্রয়োজন। ডাক টিকিট কিনতে গেলেই আবার মার্ক চাই। টাকা তো বদলানো হয়নি!

ঘরের চাবি পেয়েছিলাম একটা নিরেট কাঠের বলের সঙ্গে আঁটা অবস্থায়।

চাবিটার সদ্‌ব্যবহার করে লিফ্‌টে চড়ে নিচে এলাম।

সহসা বেথেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বললাম, আমাকে একটু সাহায্য করবে? এ দেশে তো মার্ক চলে। দু পাউণ্ডের একটা ট্রাভলার্স চেক ভাঙিয়ে নিতাম।

একটি লোক বললে, স্টেশনে গেলে ভাঙানো সম্ভব।

এত রাত্রে পাব তো?

রাত এগারোটা পর্যন্ত পাবে।

বেথেল আমার সঙ্গে এল। এগারোটা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক বাকী। ছুটে ছুটে স্টেশনে এলাম। একটা লোককে জিগ্যেস করা হল, কোথায় ভাঙানো যায়? সে ইংরেজী বোঝে না। হাবভাবে যখন তাকে ব্যাপারটা জানানো হল, লোকটা আমাদের আর-এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে এল। ভদ্রলোক ইংরেজী বুঝতেন। শুনে বললেন, এখানে তো পাবে না। কোথা থেকে আসছ?

হোটেল থেকে।

হোটেলেই তো ভাঙিয়ে নিতে পার।

ফের হোটেলে ফিরে এলাম। ম্যানেজারকে বলতে তিনি তখনই ওদেশীয় টাকা দিলেন চেকটার বদলে।

পরদিন সকালে যখন যাত্রা করলাম, চড়া রোদ উঠেছে। কাগজে পড়লাম, লণ্ডনে নাকি ভয়ানক বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়েছে। তার ফলে তিনটে লোক জখম হয়েছে। কিন্তু জার্মানিতে কোথায় কি! গরমের চোটে প্রাণ যায়। বাংলা দেশের মতো রোদ এখানে।

হের হিটলারের হেড কোয়ার্টার্স দেখলাম। একখানা বিরাট তিন মহলা বাড়ি। সামনের দিকটায় চারতলা। সেখানে ভীষণ-ভাবে বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল। অসংখ্য গহ্বর বাড়িটার গায়ে। ছাদের একটা ধার ধসে গিয়েছে। ঠিক তার বিপরীত ফুটপথের লাগোয়া বিরাট বাড়িখানা দখল করে আছে ইউ এস এ-র সৈন্যদল। ট্রাম যাচ্ছে রাস্তার ধার দিয়ে। কংক্রীটের প্রসারিত রাস্তা। আশপাশের বাড়িগুলিও অক্ষত নেই।

হিটলার যে বাড়িতে স্যালুট নিতেন অমাত্যবর্গের, সে বাড়িখানাও দেখলাম। সেখানেও বোমা বর্ষণের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। পাশে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী। কাকচক্ষু জল।

আরো এগোতে লাগলাম। পিছনে পড়ে রইল শত শত আঙুর খেত। কত পর্বত। কত বন্ধুর পার্বত্য উপত্যকা। কত মালভূমি। ওক, বীচ আর পাইনের বন। কত ছায়ানিবিড় দুর্গম বনানী। কত অসংখ্য অপরিচিত বনৌষধি!

সিমেন্ট করা রাস্তার উপর দিয়ে বাস চলেছে তীব্র গতিতে।

ম্যুনিক-এ এলাম। বেভেরিয়ার রাজধানী ম্যুনিক। অপরূপ অভিজাত শহর। ট্রামের রঙ নীল। ঝকঝকে দোকানপাট। ফুট-পথের মাঝখানে গ্লাসকেস। তাতে নানা রঙের কাপড়জামার প্রদর্শনী। ব্যাঙ্ক, অফিস—কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

একটা হোটেলে লাঞ্চ খেতে ঢোকা হল। তারা এত লোক

দেখে সহসা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে খেতে দিতে পারল। ইওরোপের যে কোনো হোটেলেই লাঞ্চ খেতে যাও, এক ঘণ্টার আগে উঠতে পারবে না। তারা জিনিসগুলিকে গরম করে। অনেক সময় তৈরি করে। তারপর একে একে ভোজ্যবস্তুগুলিকে ডিশে এনে হাজির করে। যে হোটেলে খেলাম, তাদের একটা বিজ্ঞাপন-পত্র পেলাম। হোটেলের নাম ও ঠিকানা : Hotel Schottenhamel, München. বিজ্ঞাপন-পত্রে একটি পিঙ্গলবর্ণের হরিণের ছবি আছে। হরিণের মাথায় আবার ডোরাকাটা ফিতে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আলফ্রেড হোটেল-মালিকের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

এক নববিবাহিত বর-বধূ তাদের পরিজনবর্গ নিয়ে একটি টেবিল দখল করে ছিল।

আলফ্রেড বললেন, ব্রডওয়েসের ভ্রমণকারীদের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছি। বিবাহ সুখের হোক।

আমরা হাততালি দিলাম।

পথে পড়ল ব্রাউন হাউস। বিরাট দুর্গ তোরণ। সুপ্রাচীন কারুকার্যময় ঐতিহাসিক সৌধরাজি। একটা ক্যাথিড্রল দেখলাম। একে বলা হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্যাথিড্রল। বিরাট তার হলঘর। সাততলার মত সব বাড়ি। গির্জার চূড়া।

এক একটা উদ্ধত বাড়ির বৃদ্ধিকে চূর্ণ করে দিয়েছে গত যুদ্ধের বোমাবর্ষণ। আজো তার দুর্দৈব অভিশাপ বহন করছে ভয়াবহ হতশ্রী হর্ম্যগুলি। হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কয়েকটি লোকালয়। ভগ্ন, বিধ্বস্তরূপ শ্মশানের স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কী ক্ষতি, কী ক্ষত যে সঙ্কেতময় হয়ে উঠেছে সমস্ত জার্মানি জুড়ে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

বাসে আর টেকা যাচ্ছিল না। অসহ্য রোদ আর গরম। সূর্যের

দ্বিপ্রাহরিক অভিযান যেন প্রখর হয়ে উঠেছিল আমাদেরই কয়েকটি প্রাণীর উপর দিয়ে। গা থেকে কোট খুলে ফেললাম। ওয়েস্টকোট খুললাম। গলা থেকে টাই দিলাম শিথিল করে। কপালের ঘামকে মুছে নিলাম রুমাল দিয়ে।

মিস কটনের কাছ থেকে জল চেয়ে খেলাম।

চোখে পড়ল অনেকগুলি রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের ভিতরের চেয়ে বাইরেটাই দেখবার। তৃণাচ্ছাদিত খানিকটা জায়গায় একটি করে টেবিল। তার চার পাশে চারটে চেয়ার। মাথার উপর একটি করে সুবৃহৎ ছাতা। ছাতার কাপড়টা হলদে বা সবুজ।

বেলা তিনটে নাগাদ হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। আকাশে মেঘ। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল প্রচণ্ড মার্তণ্ড। কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসতে লাগল দুপাশের সবুজ বনভূমি থেকে। কোথাও হয়তো বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এ তারই সুগন্ধি সঙ্কেত। দেখতে দেখতে অগণিত পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়লাম। কোনোটা ছোট, কোনোটা বিরাট। একেকটা এত বড় যে আকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো। পাহাড়ের গায়ে শেওলা জাতীয় অসংখ্য গাছ-গাছড়া। দূরে দূরে কয়েকটি কুঁড়েঘর। না জানি, কেমন করে এখানে—এই দেশে মানুষ থাকে ওই কুঁড়েঘরে।

একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে বাস চলতে লাগল। যতক্ষণ না সুড়ঙ্গ শেষ হল, রুদ্ধনিশ্বাসে বসে থাকতে হল প্রাণটি হাতে করে। একটা ভারী, বিশমনি পাথরের চাঁই ধসে পড়লেই নিশ্চিন্ত। এই সুড়ঙ্গটিকে বলা হয় ফার্ন পাস (Fern pass)। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারিধার অন্ধকার। কানে শুধু অনুভব করছিলাম —বসে বসে গাড়ি চলার শব্দ। এই অন্ধকারে কি ইংরেজ, কি ভারতীয়—সবাই সমান। সকলকারই গায়ের রঙ তখন এক। সকলকারই মনের ভাষা তখন অভিন্ন।

সুড়ঙ্গ যখন পার হলাম, বাইরে এসে দেখি আকাশ অন্ধকার। আর চারপাশে কী পাহাড়ের পরিবৃতি!

যেখানে অধিক পাহাড়ের প্রাবল্য, সেখানে আলোর আশ্বাস নিরর্থক। গাছে বৃষ্টি পড়ছে, আগাছায় বৃষ্টি পড়ছে। অরণ্যে বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভারের চোখের সামনে যে কাঁচের শার্সি তার উপরও বৃষ্টি পড়ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টিপথ। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার (Windscreen wiper) চলতে লাগল। ঘন ঘন মুছে দিতে লাগল কাঁচের উপর থেকে জলবিন্দু। বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা পানবসন্তের গুটির মতো। রাস্তা ভিজে উঠল বারিবর্ষণে।

গলফ্ ক্লাব পার হলাম।

পার্বত্য প্রদেশের কয়েকটি বাড়ি যেন হাত বাড়িয়ে ধরে নিতে চাইল। কোনো বাড়ির জানালা বন্ধ করছে কোনো গৃহিণী। কোনো স্ত্রীলোক হাতলওয়ালা বুরুশ দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে।

ঝাউগাছের মতো একরকমের গাছ। বৃষ্টিতে তার পাতাগুলি কাঁপছে।···কাঁপছে ইউক্যালিপটাসের শাখা-পল্লব। রূপোলি-সবুজ অলিভকুঞ্জ। আছাড় খেয়ে পড়ছে নবীন আঙুরলতার সবুজ তনুসম্ভার।

এ পর্যন্ত বেশ সহ্য করা যাচ্ছিল। আর বোধ হয় পারা গেল না। ছিঁড়ে পড়তে চাইল শিরা-অনুশিরা ভয়ে, আশঙ্কায়।—নূতন পরিবেশ, নূতন পৃথিবীর ভীতিকর পার্শ্বপরিবর্তনে। মনে হল আজকের জন্যই বোধহয় জীবন ধারণ করেছিলাম। কাল আর থাকব না। শচীনদার কথা বারবার মনে আসছিল।—

আমাকে ব্রডওয়েসের বাসে তুলে দিতে এসে কত প্রার্থনাই জানিয়ে গিয়েছিলেন শচীনদা। আমি আমার মা-বাবার একটিমাত্র ছেলে। বাবা বছর পাঁচেক হল মারা গিয়েছেন। কলকাতার বাসায় আজ আমার অসহায়, বিধবা মা বসে বসে দিন গুনছেন। কবে আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আবার দেশে ফিরব!···অকূল

সমুদ্রে আমাদের জাহাজখানাকে দেখাবে মোচার খোলার মতো! আমার চাঁদমুখ (?) দেখে মায়ের দেহে প্রাণ ফিরে আসবে! কত ঠাকুর-দেবতার কাছে মা মানত করে রেখেছেন। আমি ফিরলে মা পূজো দেবেন। যেন আমি শিশু। একান্ত অসহায়। তাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী শচীনদা বলেছিলেন, ভগবানের নাম নিয়ে চলাফেরা কোরো। ঈশ্বরই তোমায় রক্ষে করবেন। আবার দেখা হবে।

বাস ছেড়ে দেবার সময় শচীনদার চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল।

শচীনদার অভয় বাণীতে কী ইঙ্গিত ছিল সেদিন, জানি না। কিন্তু ভয় পেতে লাগলাম বারবার। কোন্ এক অখ্যাত-অজ্ঞাত স্থানে না জীবন শেষ হয়ে যায়!

আকাশে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দ হতে লাগল। পাহাড় ফাটানো বজ্রের শব্দ কী নিদারুণ! লণ্ডনে বজ্রকে চিনেছি। বাংলাদেশের বজ্র আর বিলেতের বজ্র—এক নয়। দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। বাংলা দেশের মানুষ—মাটি—সবই যেমন নরম, বজ্রও তেমনি নিস্তেজ। বাংলাদেশের কৃষক, মজুর বজ্রপাতের সময় মাঠে কাজ করে, জমিতে লাঙ্গল দেয়, চালে উঠে গোলপাতার ছাউনি বাঁধে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে যায়। পুকুরের আল বাঁধে। ইওরোপের বজ্র কিন্তু মারাত্মক। তার মনের মধ্যে কোথাও কোমলতার লেশমাত্র নেই। সে দুর্ধর্ষ, সে দুরন্ত, সে উদ্ধত। কদিন আগেই তো একটা বিলাতি দৈনিকে দেখেছি, বজ্রপাতের ফলে অনেক লোক মারা গিয়েছে। রেসকোর্সের মাঠে বজ্র আর বিদ্যুতের ফলে বহু লোক জখম হয়েছে। এরকম একটা নয়—বহু ঘটনাই ঘটে। বিলেতের মতো বিরলপর্বত স্থানে যদি এই ঘটনা ঘটে, না জানি এই ঘন পাহাড়ের এক্তিয়ারে—ঘন পাহাড়ের শাসনভুক্ত এলাকায় আমাদের কি হাল হবে! এই দুর্যোগ কী শুধু আমাদের জন্যই? এই দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কী

আজ পাহাড় এগিয়ে আসছে তার অতিথিদের বরণ করতে? তার অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করতে?

ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলাম।

বাসের ছাদের খানিকটা অংশ কাঁচের। অন্য সময় সেটা একটু আলগা থাকে হাওয়াবাতাস খেলবার জন্য। এখন সেটাকে ভালো করে এঁটে—চেপে বসিয়ে দেওয়া হল।

আকাশ যেন বন্দুক দাগতে লাগল। বিকট শব্দ উঠতে লাগল পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে। কড়াক···কড়াক···যেন কেউ গুলী ছুড়ছে একদল নিরীহ পক্ষিশাবকের উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ের উপর শাদা ধোঁয়া। ধোঁয়া নয়। এটাকেই বলে তুষার। মেঘের সঙ্গে তুষার এক হয়ে যেতে লাগল। আমার জীবনে এই প্রথম তুষার দেখলাম!

জার্মান-বর্ডার পার হলাম।

অস্ট্রিয়াতে ঢুকব। পাসপোর্ট বার করতে হল। গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াল। রাস্তার পাশ দিয়ে কুলকুল করে তখন জল গড়িয়ে চলেছে। অন্য দু-একখানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের আমাদেরই মতো অবস্থা। ড্রাইভার নেমে গেল সেই বৃষ্টি ও বিদ্যুতের মধ্যেই গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে। অস্ট্রিয় পুলিশ একবার আমাদের বাসের গা ঘেঁসে চলে গেল। সকলের গতিই ত্রস্ত। মোটর সাইকেলের গর্জন, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব্দ—সবগুলো মিলিয়ে একটা অপরূপ সংঘটন!

আবার গর্জন করে উঠল আমাদের গাড়ি।

আমরা অনুমতি পেয়ে গিয়েছি অস্ট্রিয়ায় ঢোকবার।

এদিকে আকাশের অবস্থা তো সাংঘাতিক। চক্রবালে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎরেখা! কখন যে বৃষ্টি আর বজ্রপাতের ঘনঘটা থামবে, তারই অপেক্ষায় দুর্গানাম জপ্ করছিলাম।

দেখতে দেখতে বাস এগিয়ে চলল।

দুপাশে বিজন বন। কোথাও পাহাড় থেকে ঢল নামছে ঝির-ঝির শব্দে। একটা পোস্টার দেখলাম। তাতে লেখা: Noch 19/5. Klm.

আর একটা পোস্টার। তাতে লেখা: Golf Hotel. Garmisch.

মনে হল একটু এগোলেই পাহাড়। কিন্তু দূর ছিল।......

দুপাশে দুসারি উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ।...

তার মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম অস্ট্রিয়ায়। আবার সেই অন্ধকার, বিজন মৃত্যুর মতো। আমরা মৃত্যু থেকে মহাজীবনের পানে এগিয়ে চললাম।

গিরিপথ যখন পার হলাম, দেখি, বরফে চারিধার কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

বিরাট দৈত্যের মতো পাহাড়। তারই সম্মুখীন হলাম। কোথায় যে এর শুরু, আর কোথায় যে এর শেষ, বোঝা কঠিন। শুনলাম, জার্মানির সবচেয়ে বড় পাহাড় বলতে যেটাকে বোঝায়, এই হচ্ছে সেই পাহাড়। "Zugspitze"-এর দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত।

১৯৫১ সালে—দলপতি আলফ্রেড মাইক নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন: ১৯৫১ সালে একজন ভারতীয় ছাত্র এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়।

এসেছিল ইংরেজ ছাত্র। জার্মান ছাত্র। আমেরিকান ছাত্র। কেউ পারল না। কেউ না। সক্ষম হল একজন ভারতীয় ছাত্র!

সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি! আমার সঙ্গীরা স্মিত মুখে আমার দিকে চাইল।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। যেন ভারতবর্ষের সমস্ত ছাত্রের আমিই আজ একমাত্র প্রতিনিধি তাদের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব আমারই সপক্ষে সমুপস্থিত।

বজ্রপাত বন্ধ হল।

অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশের একটা দিকে আলো ফুটে উঠেছে। বৃষ্টি তখন ধরে গিয়েছিল। একরকমের গাছ দেখলাম যার ডালপালাগুলিকে উর্ধ্ববাহু বলা চলে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে সেই কনিফার গাছের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তাতে তখনো বৃষ্টির চুম্বন লেগে আছে।

নেমে একটা হোটেলে কফি খেলাম। বেলা তখন চারটে।

হোটেলের কর্ত্রী দুটি মেয়ে। ঠোঁটে রঙ নেই। অথচ কী লাবণ্যময়ী। আর তেমনি সরল। ইংরেজী তেমন জানে না। জার্মান ভাষায় কথা বললে।

হোটেল থেকে বেরোবার সময় একটা কাগজ পেলাম। তাতে লেখা : Hotel Lowen. Feldkirch. Vorarlberg. 'O'sterreich.

ফের গাড়িতে চড়লাম।

গাড়ি এগোতে লাগল। এবার কিন্তু আমাদের যাত্রা আরো জটিলতার পথে।

গাড়ি উঠতে লাগল পাহাড়ের গগনস্পর্শী চূড়ার উপর। এ সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত নয়। তার একটি ছোট সংস্করণ। সেখানে আঁকা-বাঁকা, পেঁচানো-পেঁচানো পথ। পথের ধারে অসমতল মাঠ। সেই মাঠ থেকে গরু তাড়িয়ে রাখাল বাড়ি ফিরছে। আমাদের দেশের রাখালের মতো এ রাখাল রিক্ত-বেশ নয়। এ রাখালের সাজ সায়েবের মতোই। উপায় কি? যে দেশের যা সাজপোশাক। শীত-প্রধান দেশের এই হচ্ছে উপযুক্ত পোশাক। রাখালের হাতে ছোট একটা লাঠি।

গাড়ি ধীরে ধীরে উঁচুতে এগোতে লাগল। আর আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে পথ এত সঙ্কীর্ণ যে সেখান দিয়ে দুটো গাড়ি যেতে পারে না স্বচ্ছন্দে। একটাকে থামতে হয়। Keep to the right চলেছে গাড়ি। আর, একখানা পাস করলে

তবে অপরটিকে চালানো সম্ভব। যখন মোড় ফেরে তখন খুব সতর্ক থাকতে হয় ড্রাইভারকে। একটু অন্যমনস্ক হলেই কোথায় গিয়ে যে গাড়ি গুঁড়িয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। আমাদের ড্রাইভার অদ্ভুত সুদক্ষ ব্যক্তি। কোথাও কারো সঙ্গে ধাক্কা না লাগিয়ে ঠিক টেনে তুলতে লাগল গাড়িখানাকে। আলফ্রেড চেঁচিয়ে যেতে লাগলেন, এগারো শো ফুট উঁচুতে উঠলাম আমরা।

এবার পনেরো শো ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছি···

এবার দু'হাজার ফুট উঁচুতে···

এবার পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে···

আর আমরা দাঁড়িয়ে উঠে এক একবার নিচের দিকে চাইছি।

ভয়ে মাথা ঘুরে যায়। নিচের গড়খাই এত নিচে যে দেখলে অন্তরাত্মা শিউরে উঠে।

কোথাও দুপাশে সুনীল সরোবর। কোথাও বা একেবারে নিচে নীল হ্রদ।

একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি পথের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এরকম একটা নয়। একাধিক প্রতিমূর্তি দেখলাম পাহাড়ের উপর উঠতে গিয়ে। প্রথমে দেখলে চমকে উঠতে হয়। যেন সত্যিকার মানুষ। শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো কারণই থাকে না।

উঠে চললাম একেবারে উঁচুতে।

আলফ্রেড বললেন, পাঁচ হাজার পাঁচশো ফুট···

একেবারে মেঘের গায়ে গিয়ে ঠেকলাম। উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে আর কিছু থাকে না।

পাহাড়টাকে কুঁদে কুঁদে পথ করা হয়েছে। মানুষের অসাধ্য আর কী রইল?

এবার নামার পালা।

নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে লাগল বাস।

বহু কাঠের বাড়ি নজরে পড়ল। নজরে পড়ল কাঠগোলা।

হিন্দুরাই মন্দির করে দেখেছি। এবার দেখলাম ক্রীশ্চানদের মন্দির। গ্রামের অবিকল পঞ্চাননের মন্দিরের মতো। এক চিলতে। ছাদ ঢালু। দরজা নেই। সে ঘরে রয়েছে মেরী মার মূর্তি। পায়ের গোড়ায় চারটি ফুল।

পথের ধারে কেউ বা কারা তাঁবু ফেলেছে। অদূরে বনালয়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে একটা ট্রেন যাচ্ছে। ট্রেনের কামরার বাতিগুলো চিক্‌চিক্ করে উঠছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ট্রেনটাকে মনে হচ্ছে যেন শুঁয়াপোকা। আর বাতিগুলোকে মনে হচ্ছে চকমকির স্ফুলিঙ্গ।

ইনস্‌ব্রুকে তখনো আসিনি। আবার একটা মন্দির পড়ল পথের পাশে। অদূরেই জলের কল।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে জল খেতে নামল।

এই অবসরে আমিও আর পারলাম না। নেমে পড়লাম।

জুতোটা খুলেই সহসা মন্দিরে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। যীশুখ্রীষ্ট বসে আছেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধরে। এক আকাশ থেকে এ যেন আর এক আকাশ। ঠিক ঠাকুরের মতোই তাঁর সৌম্য মূর্তি। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল। চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ। এ কি দেখলাম? পায়ের গোড়ায় শ্বেত করবীর মতো কয়েকটি ফুল! তুটি জ্বলন্ত মোমবাতি। কে এই পটুয়া যিনি এই যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি তৈরি করেছেন? তাঁর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন? কাকে স্মরণ করব? কার ধ্যান করব?

ইতিপূর্বে কয়েকবার গির্জায় গিয়েছি। ইংলণ্ডের গির্জায় উপাসনা-সঙ্গীত শুনেছি।

"Show me the way O Lord,
And make it plain;

I would obey Thy Word,
Speak yet again ;
I will not take one step until I know
Which way it is that Thou wouldst
have me go."

ভাবার্থ যার

আমারে দেখাও তোমার পথ প্রভু,
যে পথ সোজা—নয়কো বন্ধুর।
তোমার কথা ঠেলিনি নাথ কভু,
আবার বলো—শুনি সে প্রিয়-স্বর ॥
একটি পা-ও ফেলব না ক' বৃথা
যে পথে তুমি না ফেলাবে মিতা,
যে পথ মোর করোনি মঞ্জুর !

সঙ্গীতের রসগ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সময় সময় মন হতাশায় মুষড়ে পড়েছে। মুষড়ে পড়েছে যখন (সব নয়) কয়েকটি ধূর্ত ধর্মযাজক বোঝাতে চেয়েছে, ক্রীশ্চানের ঈশ্বর অন্য জাতের নয়। অন্য জাতের ঈশ্বরকে আমরা মানি না। অথচ আমরা হিন্দু তো ক্রীশ্চানের ঈশ্বরকেও মানি। ঈশ্বর আবার দুটো হয় নাকি? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও যেমন আমাদের উপাস্য, যীশুখ্রীষ্টও তেমনি যে আমাদের ঈশ্বরের অবতার !

হিন্দু হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম নতজানু অবস্থায়—সেই বিজন মন্দিরের মধ্যে !

ইন্‌স্‌ব্রুকে এসে যখন পৌঁছলাম—বিকাল ছটা।

অস্ট্রিয়ান টাইরলের রাজধানী—ইন্‌স্‌ব্রুক। ট্রলি বাস আছে, ট্রাম আছে। বহু দোকান, রেল-স্টেশন, সিনেমা হল। ব্রঞ্জ, লোহা, চামড়া ও কাগজ শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

আমাদের হোটেলের নাম হল: হোটেল টাইরল—হোটেল ইওরোপা, ইন্‌স্‌ব্রুক। আমার ঘরের নম্বর পেলাম—Zimmer N. R. 401. চারতলায়।

ঘরে গিয়ে জানালা খুলে দাঁড়াবা মাত্র বুক শীতল হল। চমৎকার ঘর। শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় দেখা গেল ঘর থেকে। পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার জমে আছে পর্বতশৃঙ্গে।

ডিনার খেতে গিয়ে আরো মুগ্ধ হলাম। আরো চমৎকৃত। বিরাট হলঘর। ইলেকট্রিক বাতির ঔজ্জ্বল্যের নিচে শুধু শাদা চামড়ার ভিড়। আর যারা পরিবেশন করছে, লক্ষ্মী সরস্বতীর মতো তাদের রূপ। ছুটি মেয়ে। পরনে কালো স্কার্ট। কিন্তু ছুখানি নগ্ন বাহু আর পা থেকে যেন স্বর্গীয় দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গাল গোলাপের মতো লাল টকটকে। মাথার চুল সোনার মতো।

খেতে বসে অনেকক্ষণ ধরে মিচেলের সঙ্গে রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হল। টি এস এলিয়ট, ওয়াল্টার ডিলা মেয়র, অডেনের কথা উঠল। অপেক্ষাকৃত যাঁরা তরুণ কবি তাঁদের নামও উঠল। যেমন এলেক্স কমফর্ট, কিথ ডগলস, সিডনী কিইস্‌। উঠল আমেরিকার কথা।

জিগ্যেস করলাম, তোমরা কি চাও আবার যুদ্ধ বাধুক ?

আর দরকার নেই যুদ্ধে। এখনো ঘা শুকোয়নি।—ইংরেজ মিচেল বললে।

আমেরিকার ব্যাপার কি রকম বুঝছ ?

ওরা অনবরত ভয় পাচ্ছে, পাছে ওদের ওপর আক্রমণ আসে। তাই চেঁচিয়ে কম্যুনিস্টদের কোণঠাসা করছে। ওরা ইংরেজের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। যেহেতু ওদের টাকা বেশি !

খাওয়ার পর লিফটে করে উপরে উঠলাম।

একটি মেয়েকে দেখে ভালো লাগল। হোটেলের ঘরগুলি থাকে ওর তদারকে। ও বিছানা ঝাড়ে, বেসিন পরিষ্কার করে। কেউ ডাকলে তাকে সাহায্য করতে যায়। যদিও সে ঝিয়ের কাজ করে, তার রূপ দেখলে আমাদের দেশের অনেকেই বর্তে যাবে ! ওরকম রূপসী আমাদের দেশে কটা মেলে ? ওরকম প্রাণবন্যায় উচ্ছল—ওরকম হাসিখুশিতে উজ্জ্বল ?

পরদিন সকাল আটটার পর হোটেল ইওরোপা ত্যাগ করলাম।

বাজার, শহর দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে এলাম ইন্‌স্‌ব্রুক।

গতকালের সেই পিছনে ফেলে আসা পথকেই আবার বরণ করে নিলাম। সেই পরিচিত পথ দিয়েই খানিকটা এগিয়ে এলাম। নিচে সুগভীর খাদ। কোথাও সরীসৃপের মতো নদী বয়ে যাচ্ছে উদ্দাম ছন্দে। কোথাও জনপদের সুস্পষ্ট আভাস। কোথাও দোকানের চাকচিক্যময় হাতছানি।

এবার নূতন পথে মোড় ফিরলাম। এখানেও সেই দুর্জয় পাহাড়। পাহাড়ের উপর অসংখ্য ঝাউগাছ। ঝাউগাছ কিনা—ঠিক জানি না। তবে দেখতে কতকটা ওরই মতো। চালার মতো মন্দির। তাতে যীশুখ্রীষ্টের বিগ্রহ। পায়ের কাছে শ্রদ্ধার অঞ্জলি—চারটে শ্বেত করবীর মতো ফুল।

পাহাড় চলেছে তো চলেছে। ফার গাছের বনও তেমান কোথাও ঘন, কোথাও বিরল হয়ে দেখা দিচ্ছে। জায়গাটাকে বলা হয় ইন-উপত্যকা। এখান থেকে ভিয়েনা খুব কাছে।

দুর্ধর্ষ পাহাড়ের আর শেষ নেই। তার পাশ দিয়ে শাদা খড়ির মতো খাল চলেছে উদ্দাম গতি নিয়ে। কোথাও দুটি পাহাড়ের মধ্যিখানে একটি সরু সেতু। দূর থেকে আমরা দেখছি। নী নী করছে সুতোর মতো সেই সেতু। তার উপর দিয়ে দুঃসাহসিক মানুষ যাতায়াত করে। তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়। একবার যদি ছিটকে পড়ে, একবার যদি অসতর্ক হয় তার মনোযোগ—আর আশা-ভরসা নেই। একটা ছোট পুতুলের মতো সে দু হাজার ফুট উঁচু থেকে তলায় পড়বে। তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। একান্ত তলায় পাথর, জঙ্গল আর উন্মথিত ঝরনাস্রোত। উত্তাল জলকল্লোল।

বেলা যখন সাড়ে দশটা—তখনো আমরা পর্বতে। পর্বতের মাথার উপর পাগড়ির মতো রাউণ্ড দিচ্ছি। সহসা অন্ধকার করে এল পার্বত্য আকাশ। আবার কি বজ্র নামবে? মনে মনে শঙ্কিত হলাম। বজ্র নয়—বৃষ্টি নামল। গলে পড়ল মেঘ পাহাড়ের গা বেয়ে। তুফান তুলল ঝরনাস্রোত। সে একটা দেখবার মতো জিনিস। শাদা, পুঞ্জ পুঞ্জ তুলোর মতো তালগোল পাকিয়ে ফেনায়িত ঝরনা পড়ছে নদী হয়ে। পাথরের নুড়িগুলো দুলে দুলে উঠছে স্রোতের আবর্তে। আর পাখির চূর্ণবিচূর্ণ পাখার মতো চারিধারে তুষারের ঝড়।

আমাদের বাস চলল শিকারী বাজের মতো ঘুরতে ঘুরতে।

যাত্রীদের মধ্যে কেউ গান গাইছে। কেউ চকোলেট বিতরণ করছে।

ল্যাণ্ডেকে (Landeck) এসে আলো পেলাম। তখনো বৃষ্টি থামেনি। কিন্তু মনে হল, পাহাড়ের মাথা থেকে অনেকটা আমরা নেমে এসেছি। চোখে পড়ল বাড়ি, বাগিচা, কারখানা, রেল-স্টেশন, অফিস। জায়গাটা নির্জন। কিন্তু অনেকগুলি পথিককে দেখলাম। কেউ চলেছে গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে, কেউ বা মাথায় ছাতি নিয়ে।

একটা বিরাট পাথরের গেট পার হলাম। গেট তো নয়—যেন দুর্গতোরণ।

এখান থেকে সেন্ট এন্টনে (St. Anton) যাব। পোস্টারে দেখলাম লেখা : 25. K L M (কিলোমিটার) to St. Anton.

রাস্তার পাশে কাঠের বেড়া। খেত, বন, খাল। খালের উপর কাঠের সেতু।

আবার দৈত্যের মতো বিরাট বিরাট পাহাড় শুরু হল। পাহাড়ের গায়ে তুষার। ধারে ধারে বিজন বনজঙ্গল। বনজঙ্গল ভিজছে বৃষ্টিতে।

সহসা দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেল। খুব যে ঠাণ্ডা পড়েছে, মনে হল না। কিন্তু আমাদের যাত্রার এখানেই শেষ নয়। আবার উঠতে লাগল বাস উঁচুতে।

আবার বৃষ্টি শুরু হল।

আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে বর্ষাতি ও গগলস পরা লোক মোটরবাইক হাঁকিয়ে চলে গেল।

টেলিগ্রাফের তার চলে গিয়েছে ছিন্নভিন্ন খাদের উপর দিয়ে। এখানে একটা খুঁটি, আর পাঁচশো গজ দূরে ঐ পাহাড়ের মাথায় আর একটা খুঁটি। মানুষের শক্তিকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

একেবারে তলায়—মাটিতে কোথাও গরু চরছে। পাহাড়িয়া গরু। দেখতে সুন্দর।

কাঠ বোঝাই লরি চলেছে—তাও দেখতে পেলাম।

তুষারে মেঘ আর পাহাড় একাকার হয়ে উঠল।

কখনো অন্ধকার। কখনো আলোর বিকিরণ। এই সৌন্দর্যময়ী স্বপ্নপুরী চোখে যেন সুধা ঢেলে দিল।

ফেনার মতো জল যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে।···আবার সেই সঙ্কীর্ণ সেতু।

এক জায়গায় পথ ধসে পড়ে গিয়েছে হাজার ফুট নিচুতে।

মেরামত শুরু হয়েছে। আমাদের গাড়ি গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যান্য গাড়িও দাঁড়াতে লাগল। সাঁজোয়া বাহিনীর একটি বলিষ্ঠা যুবতী মেয়ে মোটরবাইক খাড়া করে দম নিতে লাগল। তার দিকে অনেকেই চেয়ে রইল।

তারপর সন্তর্পণে—একে একে গাড়িগুলিকে পাস করাবার পালা।

সেণ্ট জেকবে (St. Jacob) এলাম। তখনো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি চলেছে।

সিক্ত রেল লাইন, কাঠগোলা, রূপালী ঝরনা দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। অরণ্যের নিঃসংশয় একটা সৌন্দর্য আছে। বারে-বারে তার স্পর্শ পেলাম। আভাসে ইঙ্গিতে সে আমাদের চোখের তারায় আনন্দের দীপ্তি জাগাল। একটা কাঠের বাড়ি দেখলাম। উত্তরোত্তর সরু হয়ে তার চূড়া উঠে গিয়েছে আকাশে। বোধ হয় বজ্রাঘাতকে রোখবার জন্যই তার এই প্রস্তুতি।

সেণ্ট এণ্টনে এসে পৌঁছলাম সকাল এগারটার সময়। যে হোটেলে নীত হলাম তার ঘরও চমৎকার। দোতলার উপর। ঘরের দুটো অংশ। সামনেরটায় জলের কল, আয়না, আলো, দুখানা তোয়ালে। ভিতরেরটায় টেবিল, চেয়ার, কৌচ, সোফা, শয্যা, একখানি উৎকৃষ্ট পাহাড়ের ছবি, দুটো আলো। একটি বৃহৎ আলমারি, তার গায়ে বৃহৎ আয়না। এ হোটেলে আমরা দুটো দিন থাকব। এখানকার ঘরগুলিও একটি মেয়ের জিম্মায়। সকাল-সন্ধ্যা সে বেসিন পরিষ্কার করে। বিছানা ঝাড়ে। বালিশের ওয়াড় কাচতে দেয়। বাসিন্দারা ডাকলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে গেলাম নিচে ডাইনিং হলে।

লিফটের সাহায্যে উপরে এসে যখন উপনীত হলাম, বেলা দেড়টা।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে যেন বৈদ্যুতিক শক খেলাম।

এ কি ব্যাপার? নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। এক স্তম্ভিত বিস্ময় যেন আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে দিল। এই মেঘমেদুর দুপুরবেলা এ কি দেখছি? বিছানার উপর এক সবল দুর্ধর্ষস্বাস্থ্য শ্বেতাঙ্গ। আর তার অঙ্কশায়িনী পীনবক্ষা—ও কে? সাঁজোয়া বাহিনীর সেই বলিষ্ঠা যুবতী মেয়ে নয়? সাঁজোয়া বাহিনীর পোশাক কিন্তু যুবতীটির দেহ থেকে তখন খসে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে!

দুর্ধর্ষ স্বাস্থ্য আমার দিকে চাইল: ঘরে নক করে ঢোকা উচিত ছিল। কি চাও তুমি?

জবাব দিলাম, আমার ঘরে আমি আসতে পারি না?

তোমার ঘরের নম্বর কত?

৩২।

ভুল করেছ। এ ঘরের নম্বর ৩৩।

সত্যিই ভুল করেছি? এমন ভুলও হয়?

শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের যে পরিমাণ উত্তপ্ত হওয়া উচিত ছিল, দেখলাম তার কিছুও সে হয়নি। বরং এই অবস্থায় একজনকে সাক্ষী রাখতে পারায় যেন সে গর্বিত। আশ্চর্য ধৈর্য বটে!

বললাম, তোমাদের বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত! ক্ষমা চাইছি।

পুরুষটিকে কিছু বলতে শুনলাম না। কিন্তু যুবতীটিকে দেখলাম সশব্দে হেসে উঠতে।

অসহায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বেরিয়ে আসতে পথ পেলাম না।

নিজের ঘর পেলাম। সবচেয়ে যেটা মনোমুগ্ধকর, সেটা হচ্ছে জানালার ছুশো গজ দূরেই বিরাট পাহাড়। এক অভিনব দৃশ্য। অনবরত তুষারের ধোঁয়া উঠছে গিরিচূড়ার উপর থেকে। মেঘ আর পাহাড় সময় সময় এক হয়ে যাচ্ছে। আকাশে কখনো রামধনু। বাতাসে কখনো বৃষ্টি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আর কত যে অসংখ্য গাছ-গাছড়ায় পাহাড়ের গাখানা ভর্তি, কী বলব! শাদা ফিতের মতো জল নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

আশেপাশে মাঠকোঠার মতো ছোট ছোট বাড়ি। ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে অনেক হোটেল। অনেক দোকান। ছাগল আর গরুর পাল চলেছে ঝিমঝিমে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে। পিছনে রাখাল। আকাশে কখনো আলো। কখনো অন্ধকার।

খানিক পরে দোকান দেখতে বেরোলাম। নানা রকমের পোস্টকার্ড রয়েছে ঐ সব দোকানে। নানা রকমের ছবিতে ভর্তি। খেলনা, পুতুল, রঙিন ট্রে, প্লেট, মালার ছড়াছড়ি। দাম শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভারতবর্ষের তুলনায় দশগুণ বেশি। দোকানগুলি সাজানো আছে এমনভাবে যে, ঢুকলে মনে হয় সেণ্ট এণ্টনের দোকানে ঢুকিনি। ঢুকেছি কালীঘাটের কোনো দোকানে।

পথে বেরিয়ে দেখি বর্ষাতি পরিহিত বহু যাত্রী পিঠে ঝুলিঝোলা বেঁধে ঐ ঝিমঝিমে বৃষ্টির মধ্যে দেশভ্রমণে চলেছে। শুনলাম, এরা নাকি আমেরিকান। ভ্রমণের নেশা এদের পাগল করে দিয়েছে। পথে বেরিয়ে আমাদের হোটেলবাড়িখানার দিকে বারবার তাকালাম। বাড়িখানা সুন্দর। সামনে লন, মোটর রাখবার জায়গা, অদূরে Shell, আশেপাশে পাহাড়, সবুজ বৃক্ষনিচয়—তার মধ্যে চারতলা

বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে অনবদ্য ছবির মতো। বাড়িখানার ছবি বিক্রি হচ্ছিল দোকানে। একখানা কিনলাম।

বেলা তিনটে নাগাদ আমি আর পিটার বেড়াচ্ছি, দলপতি আলফ্রেড নিয়ে গিয়ে তুললেন আমাদের এক মদের দোকানে।

কদিন আগে সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের চিঠিখানা তাঁকে দেখিয়েছিলাম।

বললেন, তুমি তো সাহিত্যিক, সাংবাদিক। তাই নয়?

স্বীকার করলাম।

দেখি সেই কাগজখানা আর একবার।

দেখালাম। তিনি সিগারেট ধরিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। দেখে ফেরৎ দিলেন। বললেন, তা তুমি জলের এত ভক্ত কেন? জল খেলে এদেশের লোক হাসে। তোমাকে বিয়ার খেতে হবে।

পরিষ্কার অস্বীকার করলাম।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আলফ্রেড বললেন, আমরা মাতাল—এই কি তোমার বিশ্বাস? অত্যন্ত ভুল করছ। তুমি সাহিত্যিক; সাংবাদিক হতে চলেছ, যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে তোমাকে হাত মেলাতে হবে। কেউ যদি তোমাকে নিমন্ত্রণ করে সত্যিকারের মদও উপহার দেয়, তোমাকে তা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। যদি বলো, না, আমি ওসব খাব না—তারা অপমানবোধ করবে। তারা আর তোমায় কোনো পার্টিতে ডাকবে না। এই হচ্ছে ইওরোপীয় সভ্যতা। তুমি ইওরোপে এসেছ—অথচ তাদের সভ্যতা শিখে যাবে না, এটা অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। আমি জানি, একদিন তুমি বড় হয়ে যাবে। এ গরিবকে আর পুঁছবেও না। কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাকে—আমার কথাগুলো।

একটু থামলেন। বললেন, সিগারেট খাও?

অভ্যস্ত নই।

অত্যন্ত অন্যায়। অভ্যাস রাখতে হবে। সব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে যে চলতে পারে, সেই সাংবাদিক হবার যোগ্য। জানো, সাংবাদিক যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে ঘোরে। কোথাও দাঙ্গা লেগেছে। তাকে সমূহ দুঃসাহসের সঙ্গে সেই বিশেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। প্রাণের ভয় করলে সাহিত্যিক বা সাংবাদিক হওয়া যায় না। একটা সিগারেট খাও।

তিনি সিগারেট দিলেন। অগত্যা তাঁকে খুশি করবার জন্য ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম। তিনি করমর্দন করলেন।

বলে যেতে লাগলেন নিজের জীবনকথা—

এককালে তিনি সোল্‌জার ছিলেন। যুদ্ধ করেছেন বিপক্ষের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী মারা যায় জার্মান গোলার ঘা খেয়ে। আজ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। কিন্তু জীবনক্ষেত্রে তো আছেন। জীবনই তো হচ্ছে একটা আশ্চর্য যুদ্ধ! এর চেয়ে বড় যুদ্ধ আর পৃথিবীর কোথায় আছে? গোলাবারুদের যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। জীবন-যুদ্ধের শেষ নেই। অহরহ সংগ্রাম। প্রতিটি মুহূর্ত—প্রতিটি পলের সংগ্রাম। যতদিন জীবন—ততদিনই সংগ্রাম। আর শুধু কী তিনি যোদ্ধা? তিনি মনস্তাত্ত্বিক, তিনিও সাংবাদিক। এতগুলো লোককে সঙ্গে নিয়ে যিনি ঘোরাফেরা করছেন, তিনি তাদের মনের খবর রাখেন না? খুব রাখেন। নইলে তাদের তুষ্টিবিধান করছেন কেমন করে? আর সাংবাদিকতার কথা শুনবে?

তিনি পকেট থেকে টাইপকরা চিঠির একটা নকল বার করলেন। বললেন, তোমাদের বিশ্বাস করে দেখাচ্ছি, ঘুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। এই সব রিপোর্ট রোজ আমায় পাঠাতে হয় আমাদের কোম্পানীর কাছে—লণ্ডনে। আমাদের দলের মধ্যে কে কেমন লোক, জানাতে হয় নিয়মিত।

নকলটা পাঠ করে শোনালেন তিনি। তাতে দেখলাম, আমাদের সহযাত্রী মিস কটন আর মিস জোনসের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার। তারা

অস্টেণ্ডের মাঠের উপর যখন ভালো বাস পাওয়া যায়নি, দল গড়েছিল। আলফ্রেডকে অপমান করেছিল।

কী অপমান করেছিল জানি না। কিন্তু বিষয়টি বেচারার মনে নাকি লেগেছিল—বুঝতে পারলাম এই চিঠি থেকে।

বললাম, উত্তর পেলেই বা আপনি কি করবেন? যারা টাকা দিয়েছে, দলভুক্ত হয়ে এসেছে, তাদের কি আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? তারা দোষ করলে আপনি শাস্তি দেবেন?

নিশ্চয় দেব।

কী রকম?

তাদের তাড়িয়ে দেব। সে ক্ষমতা আমার আছে। তাদের দেশে ফিরে যেতে হবে নিজের দায়িত্বে। নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে।

এরকম কখনো হয়েছে?

এর আগে হয়েছে বৈকি।

কী রকম?

দুটো মেয়েকে দল থেকে বার করে দিয়েছিলাম।

তারপর?

তারপর কি হয়েছে, কী জানি। নিশ্চয় তারা ফিরে গিয়েছে নিজের বাড়িতে।

কী দোষ করেছিল, জানতে পারি?

সে শুনে আর লাভ কি? অসচ্চরিত্র ছিল মেয়ে দুটো।

দুটি মেয়েকে দল থেকে বার করে দেবার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। হোক তারা অসচ্চরিত্র। কিন্তু এই বিদেশ থেকে—এই বিভুঁই থেকে তাদের যে অপমানিত হয়ে একদিন ফিরে যেতে হয়েছে, ফিরে যাবার কষ্টকে মাথা পেতে, মর্ম দিয়ে অনুভব করতে হয়েছে, এ অনুভূতি সত্যিই আমার কাছে পীড়াদায়ক বোধ হতে লাগল। যদি তাদের ক্ষমা করা হয়েছে শুনতাম, খুশি হতাম।

আলফ্রেড বললেন, কী ভাবছ?

মনের কথা পরিষ্কার ব্যক্ত করলাম।

তাদের ক্ষমা করা যায় না। আলফ্রেড বললেন, চেষ্টা করেছিলাম। দল থেকে আপত্তি উঠেছিল। অন্তত দলের স্বার্থের দিকে চেয়ে আমাকে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল!

একখানা হোটেল লিস্ট দেখালেন তিনি। বললেন, তোমার কাছেও আছে। খুলে দেখতে পার, তলায় কি লেখা আছে।

লেখাটা পড়ে তিনি শোনালেন :

This continental coach cruises Ltd, reserve the right to alter at any time any place, itinerary, hotel and in cases of force majeure, substitution of Motor coaches, or any other arrangement owing to unforseen circumstances or any other cause.

শুনে চুপ করে রইলাম।

ডিনার শেষ করে যখন উঠলাম, রাত আটটা।

হোটেলের লাউঞ্জে এসে সকলে জমা হলাম। সেখানে প্রচুর আলো ছিল না। আধো-আলো আধো-ছায়ায় একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। বেথেলের কাছে একটা পত্রিকা ছিল। দৈনিক। সেটা টেনে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম। আমাদের মতো অন্যান্য দলের আরো অনেক মেয়ে-পুরুষ এক একটা দল গঠন করে বসে আছে।

সহসা মিস কটনের পক্ষপাতিত্ব আমার প্রতি যেন উচ্ছল হয়ে উঠল।

মিস কটন বললে, তোমাকে তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে!

অকস্মাৎ কি উত্তর দেব—ভেবে পেলাম না।

আমাদের দলের মধ্যে মিস কটনকেই বলা যায় অতি বড় সুন্দরী।

সেই সুন্দরী যদি বলে, আমাকে ভালো দেখাচ্ছে, কি উত্তর দেব

বললাম, অশেষ ধন্যবাদ।

মিস কটনের পাশের চেয়ারটি খালি ছিল। আমাকে আহ্বান করল সে : এই চেয়ারে এসে বসো।

বেশ আছি।—বললাম।

না, বেশ নেই।—মিস কটন প্রতিবাদ করল। কণ্ঠস্বর জেদী।

অগত্যা আমাকে তার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসতে হল।

মিস কটন আমার হাতখানাকে তার শুভ্র হাতের উপর তুলে নিল।

আঙুলে আংটি ছিল।

তাই দেখতে লাগল সে মুগ্ধ হয়ে।

দেখে বললে, কী পাথর এটা ? ওপেল ?

তাই হবে।

আংটিটা কার ? মানে কোনো মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছ নাকি এটা ?

সহসা এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হব—আশা করিনি।

মিস কটনের গলায় একটা মুক্তোর হার ছিল। আসল কি ঝুটো—জানি না। আমিও প্রশ্ন করব কিনা ভাবলাম : কোনো ছেলের কাছ থেকে পেয়েছ নাকি এটা ?

তার আর সুযোগ হল না।

আলফ্রেড আসছিলেন দৌড়ে দৌড়ে।

আলফ্রেডকে দেখে মিস কটন গম্ভীর মুখে বুক ফোলাল। যেন বৃষ্টিভেজা এক গন্ধরাজ পাপড়ি ফুলিয়েছে।

আলফ্রেড মিস কটনের কানে কানে কি যেন একটা কথা বলতে এসে হোঁচট খেলেন।

কটন ভ্রূকুটি করে বললে, জানি। আর স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। ধন্যবাদ !

রাত নটায় পাহাড়িয়া নৃত্যগীত হবে হোটেলে।

আমরা সকলেই উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে যথাসময়ে। মাটির তলায় একখানি আলোকোজ্জ্বল হলঘর। কিছু দক্ষিণা দিয়ে ঢুকতে হল। আমাদের দলের জন্য একটি বিশেষ টেবিল বাকী ছিল। সেইটিকে অধিকার করে, ঘিরে আমরা সকলে মিলে বসলাম। আমাদের দলের কয়েকজনের জন্য এল বিয়ারের বোতল। অবশিষ্ট সকলের জন্য এল খাঁটি মদ।

দেখতে দেখতে সমস্ত হলঘরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল স্ত্রী আর পুরুষে। একটি চেয়ারও আর শূন্য রইল না কারো জন্য।

আসরে অবতীর্ণ হল লাফাতে লাফাতে এসে তুজন শিল্পী। একজনের হাতে একরডিওন, আর একজনের হাতে বেহালা। বেশও তাদের অপরূপ। পায়ে শাদা নেটের মতো একরকম মোজা হাঁটু পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। জুতোর গড়ন বুনো। কোমরে এক রাশ বোতাম। গরম কাপড়ের আঁটসাঁট ব্লাউজের কোট। মাথায় টুপি।

তুজন যন্ত্র বাজাতে শুরু করল তুখানা চেয়ারে বসে। আসরটাকে গরম করতে লাগল্য। যার হাতে বেহালা, সে শেষকালে দাঁড়িয়ে উঠল। জার্মান ভাষায় কি বললে। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে তার ব্যাখ্যা করতে লাগল। মানে তার—বন্ধুগণ, আমরা পাহাড় থেকে নেমে আসছি। আমরা ইণ্ডিয়ান। পাহাড়ের মধ্যে ঐ যে সব জঙ্গল আছে, তার মধ্যে আমরা বাস করি। আমরা নাচি, আমরা গান গাই।

তুজন শিল্পী নাচতে নাচতে জার্মান ভাষায় গান শুরু করল। আরো তিনটি যুবক আর তুটি যুবতী এসে যোগ দিল সে গানে। গান শেষ হতেই তিনটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে গেল হল থেকে।

অবশিষ্ট যুবতী গান গাইতে লাগল। গান, কি এক অব্যক্ত

ক্রন্দন, বুঝতে পারলাম না। তবে শুনতে খারাপ লাগছিল না। বেশ উপভোগ করবার মতো।

তারপর লড়াই শুরু হল। একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে দুটি বন্য-যুবকের যুদ্ধ। নিতম্বে চপেটাঘাত করে করে এমন একটা শব্দ তুলতে লাগল, যা এর আগে আমি দেখিনি বা কোনোদিন শুনিনি। ছুরি বার করল তারা কোমরের খাপ থেকে। পরস্পর পরস্পরকে মারতে যায়। যুদ্ধে হার-জিত আছেই। একজন হারে, আর একজন জেতে। যে জেতে, সে যুবতীটিকে আকর্ষণ করে। যে হারে, সে খানিকটা দম নেয়। তারপর ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেই অপর যুবকের নিতম্বে একটা বুটের লাথি কষিয়ে দেয়। শেষকালে যুবতীটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে মিলন ঘটায়। বন্যপ্রকৃতির একটি অপূর্ব বদান্যতা!

তারপর ঘুরে ঘুরে নৃত্য। হাততালি দিতে দিতে স্ত্রী-পুরুষের নাচ। এক একটা খেলা শেষ হয়ে যায়। আর দর্শকবৃন্দের বিপুল করতালি পড়ে। আবার যুদ্ধ। মেয়েকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির আদিম জিঘাংসা—আবার মিলন। রাত এগারটা পর্যন্ত খেলা চলল।

একটি হাস্যময়ী শিল্পী-মেয়ে এসে কার্ড বিক্রি করতে লাগল। শিল্পিবৃন্দের ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড। ডাক-টিকিট মেরে পাঠালেই হল। সকলেই কিনল—আমিও।

মেয়েটি পয়সা নিয়ে বললে, ড্যাংকিসি (ধন্যবাদ)।

ওদের লীলা যখন শেষ হল, দর্শকবৃন্দের লীলা শুরু হল।··· বলনাচ।

আমাদের দল থেকেও দুজন মেয়ে-পুরুষ উঠে গিয়ে বলনাচ করে এল। যারা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল আসরে—একরডিওন আর বেহালা নিয়ে, তারাই শেষ পর্যন্ত বাজনা বাজিয়ে চলল।

এবার যুদ্ধ-সঙ্গীত। ১৯১৪—১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাসমরে যে সঙ্গীত গাইতে গাইতে ব্রিটিশ সৈন্যরা এগিয়ে চলেছিল—তারই মহরৎ।

ছেলে এবং মেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে—এক কণ্ঠে গাইতে লাগল :

"It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go.
It's a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know.
Good bye Piccadilly
Farewell Leicester Square.
It's a long way to Tipperary.
But my heart's right there."

ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ ও উদাত্ত-কণ্ঠ সত্যিই উপভোগ করবার মতো।

রাত বারোটার সময় নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা হোটেল থেকে বিদায় নেবার কালে নির্জনে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আমার ঘর ছিল যে মেয়ের জিম্মায়।

তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বললে সে বুঝবে না। তাই তাকে ছুঁয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মেয়েটির মুখে নয়, চোখে ভাষা ফুটে উঠল।

কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে তাকে নমস্কার জানালাম। নমস্কার ছাড়া আর কি দিতে পারি? কী দেবার আছে? তার জন্য কী ভাষা প্রয়োজন?

মেয়েটিও আমাকে নমস্কার জানাল। ভাষায় নয়—ভাবে।··· করমর্দনে।

"সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!"—এ কথাটাই বারবার অনুভব করতে লাগলাম। অনুভব করতে লাগলাম যখন আর্লবার্গ গিরিপথ অতিক্রম করতে যাচ্ছি। একটি উত্তুঙ্গ, বিশাল পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আশ্চর্যজনক উপায়ে পথ তৈরি করা হয়েছে।

তখন সকাল নটা। আমাদের বাস উঠতে লাগল পাহাড়ের শিখরচূড়ায়।

একটা জায়গায় নেমে ফটো তোলা হল।

তারপর আবার পর্বতারোহণ।···

প্রায় ছ-হাজার ফুট উঁচুতে গিয়ে যখন ঠেকলাম, নিচের দিকে চাইতে পারা যায় না। বুক দুড়দুড় করে! ভগবানের হাতে যে আমাদের জীবন—এ কথা ভাবাতে বাধ্য করে। মেঘ আর আমাদের গাড়ি—দুয়ে মিলে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে। সমানে পাঞ্জা লড়ে।

সেই সু-উচ্চ পাহাড়ের মাথা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গিয়েছে। কোথাও লোহার, কোথাও কঠিন কাঠের পোস্ট। তাকেই অবলম্বন করে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের মায়াসূত্র এই প্রসারিত টেলিগ্রাফের তার, দূরকে যে নিকট করেছে—বিশাল ধরিত্রীকে যে ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করেছে।

কত যে ফুল পাহাড়ের গা ভরে ফুটে আছে—তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতি পাহাড়কে অলঙ্কৃত করেছে এই সব মাধুর্যময় ফুলের মালা পরিয়ে। এখানে কাঞ্চন, কস্তুরী, বক, অপরাজিতা, চম্পক, মল্লিকা, গন্ধরাজ, নাগকেশর, কিংশুক, কৃষ্ণকলি, টগর, কদম্ব—কিছু নেই। কিন্তু যা আছে, দেখলে চক্ষু সার্থক হয়। বকুল ফুলের সুগন্ধ নেই, মালতী লতার সৌরভ নেই, কিন্তু আছে আইভি লতার হাতছানি। রডো-ডেনড্রনের স্বপ্নালু চাহনি। চেরি, ড্যানডিলিয়ন, সুইট-পী, সূর্যমুখী,

ডেজি, এস্টার, গুশফুট, লিলি, ম্যাগনোলিয়া ডিমুডেট, ক্যামিলিয়া, ব্লু-বেল, ব্লু-পপি, মহোনীয়া, জেনসিন—কী নেই ?

উঁচু থেকে এবার নিচে নামতে লাগল গাড়ি। অত্যন্ত ঢালু পথ। কোথাও জোরে একটার বেশি গাড়ি যেতে পারে না। উত্তাল হয়ে ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। শাদা, উন্মত্ত ফেনপুঞ্জে আন্দোলিত উপলখণ্ড। কোথাও মেঘলা, কোথাও সামান্য রোদ। সে-রোদ আবার ঢেকে যাচ্ছে বড় বড় গাছের পাতার আড়ালে।

ভোরালবার্গের অপূর্ব সৌন্দর্যশালী পথ আমরা অতিক্রম করতে লাগলাম ধীরে ধীরে।

বেলা এগারটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া হল। এক কাপ করে কফি; তারপর স্যুপ, আলুসিদ্ধ, মাংস, টমেটো, কপিপাতা আর কেক। সুইস-সীমান্তে এসে পাসপোর্ট দেখাতে হল। টাকা বদল করে নিলাম।

ঢুকলাম লিচটেনস্‌টাইন শহরে। একটু এগিয়ে একটা দোকান, নানা রকমের জিনিস রয়েছে সে-দোকানে। সুন্দর সুন্দর সচিত্র কার্ড, খেলনা, বাসন, মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী, বল, গয়না, লেস্‌, লেন্স ও ঘড়ি। সুইটজারল্যাণ্ডে ঘড়ি খুব সস্তা। দলপতি আলফ্রেডকে দাঁড় করিয়ে দলের অনেকেই ঘড়ি কিনল। তাদের মধ্যে আমিও একজন। দোকানের কর্মচারী একটি মেয়ের বাড়ি ইংলণ্ডে। সে ইংরেজীতে কথা বলায় অনেকেরই সুবিধা হল। ঐ দোকানেরই আর একটি মেয়ে আমার পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিল। লিচটেনস্‌-টাইনে ঢোকবার স্বীকৃতির ছাপ। ছাপটি খুব সুন্দর।

আবার বাসে উঠলাম। আবার চলা শুরু হল।

কাঠের বাড়ি, অদূরে পাহাড়, উঁচু-নিচু পথের তরঙ্গ অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে চললাম। প্রকৃতি যেন তার দ্বার মুক্ত করে দিয়েছে। কোথাও কৃপণতা নেই—প্রবঞ্চনা নেই—এমনই নিখুঁত সৌন্দর্য চারিপাশের।

ইলেকট্রিক ট্রেন চলে গেল পাশ দিয়ে। কোথাও হ্রদ—পাশে পাহাড়, চমৎকার শস্যক্ষেত্র, অবারিত ঝরনাস্রোত।

চাষ চলেছে রাই, ওট, তামাক, বীট আরো কত কিছুর। পর্যাপ্ত দ্রাক্ষাস্তবকে অবনমিত লতাকুঞ্জ।

'ভাতুজ' পার হয়ে এগিয়ে, চললাম। চললাম সুইটজারল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়ে।

যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই পাহাড়। কালো, দুর্ধর্ষ পাহাড়ের প্রাচীর-প্রদর্শনী।

জুরিখের পথে এগিয়ে চলেছি।

সরু পথের পাশে লোহার বেড়া। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিরিপথ। বড় বড় ওক, পাইন, সীডার, হথর্ন অথবা লাবার্নাম লতিকার ভিড়। লার্কের সুমিষ্ট গুঞ্জন। মধুকরের এ-ফুল থেকে ও-ফুলে মাধুকরী। মেঘমুক্ত আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি পীয়ার গাছ।

একটি পার্বত্য হ্রদকে নিচে ফেলে রেখে ফের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। কত কপি-খেত, পালং শাকের খেত আর কত হোটেল যে পথে পড়ল!

আলফ্রেড বলে যেতে লাগলেন:

এক হাজার পাঁচশো ফুট উপরে উঠলাম···

এবার দু'হাজার ফুট উঁচুতে···

দু'হাজার ফুট উঁচুর উপরেও দেখলাম কয়েকখানা বাড়ি। এক বাড়ির দরজায় একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাত নেড়ে ডাকল। আমরাও হাত নেড়ে সাড়া দিয়ে এগিয়ে চললাম। দুপাশে সবুজ শ্যামল বনরাজি। নিভৃত অরণ্যের সুশীতল সান্ত্বনা।

—এবার চার হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে:

আলফ্রেড চীৎকার করে উঠলেন।

আকাশ আর মৃত্তিকা আমাদের কাছে সমান হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো বিকার ছিল না। আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় বাসের

মধ্যে বসে রইলাম। বসে থেকে থেকে উপভোগ করতে লাগলাম দুপাশের ঘন বনজঙ্গল, সুন্দর রোদ, সুমিষ্ট ঠাণ্ডা, মাথার উপর মেঘ, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড় কেটে যারা পথ রচনা করেছে তাদের অপরিমিত কৃতিত্ব। শুধু পথ নয়, আবার "কেবল্ কার"। শূন্যে শুধু তারের উপর ভর করে গাড়ি যাচ্ছে। অনভ্যস্ত চোখে এ একটা অপার্থিব বিস্ময়!

উঠে গিয়েছিলাম চার হাজার পাঁচশো ফুট উচ্চে—দেবলোকে। নেমে আসতে হল তেমনি দূরত্ব বজায় রেখে মর্ত্যভূমিতে।

জুরিখের পথে চলেছি।

একটা রেল-স্টেশন পার হলাম। কাঠের গুঁড়িতে সেই টেলি-গ্রাফের তার। একটা হ্রদ পড়ল আমাদের পথ ছুঁয়ে। নাম 'রালা' হ্রদ।

চমৎকার শহর জুরিখ।

সুন্দর ট্রাম, সুন্দর বাস, বিরাট সৌধপুঞ্জ, হাসপাতাল, রেস্টুরেণ্ট, পার্ক—কী নেই?

নয়নরঞ্জন হ্রদ! হ্রদের উপর পুল।

স্টীমার চলেছে বিলাসভ্রমণে রত যাত্রীদের নিয়ে। হ্রদটিকে কেন্দ্র করেই যেন শহরের উদ্দীপনা, প্রাণ-স্রোত! মার্বেল স্ট্যাচু, ফুলের বাগান, স্কুল, মনুমেণ্ট—সব মিলিয়ে যেন এক অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য।

বাড়ির লনে ছেলেমেয়েরা টেনিস খেলছে। চৌরঙ্গীর মতো প্রসারিত রাস্তায় মোটরের ভিড়। কোথাও ঘিঞ্জি নয়। জায়গার প্রাচুর্য সর্বত্র।

বহু লোককে দেখলাম, টাই না পরে চলেছে।

নীল রঙের ট্রাম অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চললাম, পেলাম ফুটবল গ্রাউণ্ড। ফুলের গ্লাস-হাউস। অদূরে পাহাড়। তখন বেলা সাড়ে চারটে। সহসা অন্ধকার করে এল পৃথিবী। আকাশে মেঘ।

একটা ট্রেন দেখলাম—ইলেকট্রিক ট্রেন। হ্রদের পাশ দিয়ে বনজঙ্গল ভেদ করে চলেছে। আবার দেখা দিল গ্রাম্য সৌন্দর্য।

পিচের নির্জন সমতল পথ। দুপাশে বর্ণাঢ্য বনস্থলী। মেঘলা আকাশকে হাত তুলে আহ্বান জানাচ্ছে সেই গম্ভীর বনস্থলীর অরণ্য-মেয়েরা।

অনেক কাঠের কুটির পার হলাম—অনেক কাঠগোলা। এক জায়গায় রাস্তা মেরামত হচ্ছে। হারিকেন জ্বলছে। সাবধান করবার জন্য এই হারিকেন। পরিব্রাজকের দল মোটর বাইক হাঁকিয়ে তীরবেগে চলে যাচ্ছে।

একটা হোটেলের ধারে রয়েছে দোলনা। তাতে কয়েকটি শিশু দুলছে।

এখানে খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। দেখলাম, পথ আর্দ্র। ছাতি হাতে বৃদ্ধদম্পতি চলেছেন। গাছের পাতায় জল।

আর একটা শহরতলি পার হলাম।

'লাকেস্ ভালেন্স্টাট্' (হ্রদ) দেখা দিল। ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার মতো প্রসারিত। আকাশ আরও অন্ধকার করে এল। দেখি, বাদলের হাওয়ায় আপেল বাগানগুলি কাঁপতে শুরু করেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হল। "উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার" ঘুরতে লাগল ড্রাইভারের চোখের সামনে। বাসের মাথায় স্কাইলাইটের ঢাকাটা আলগা ছিল, সেটাকে চেপে বসিয়ে দেওয়া হল। যাতে ভিতরে না জল আসে। একটু যেতেই কিন্তু রাস্তা শুষ্ক, আর জল নেই। চারধারে আলো ফুটে উঠেছে। আর সে আলোর মধ্যে সাক্ষাৎ অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট আকাশচুম্বী গিরিবেষ্টনী। জায়গাটার নাম ভাল্স্ভি।

পথে একবার কফি খাবার জন্য নামতে হল। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। ভিতরে দেখি হল্লা করছে লোকজন। এ যেন বাগবাজারের এক চায়ের দোকান—বিলেতের বলব না। কারণ তারা বড় সতর্ক,

বড় বেশি হিসেবী। চুপচাপ খায়, আস্তে আস্তে কথা বলে। তারপর সরে পড়ে।

আমরা অনেকেই কফি চাইলাম। আমার পাশে বসেছিল মিসেস জেবসন। সে চাইল চা।

চা-ই পেল। আমরা দিব্যি কফিতে চুমুক লাগাতে লাগলাম। চা খেতে গিয়ে জেবসন ন্যাকার তুলতে থাকে।

চা খাবে না?—জিগ্যেস করলাম।

একে চা বলে? গন্ধ দেখো না একবার!

জেবসনের মুখাকৃতি দেখলে যে কেউ হাসবে। হাসলও সকলে।

গন্ধ শুঁকলাম চায়ের। সত্যিই, চা থেকে এমন গন্ধ কি করে বার হয়?

চা সে খেতে পারল না। কফি নিল। কিন্তু ওঠবার সময় ঐ চায়ের দামও তাকে দিয়ে উঠে আসতে হল।

বাসে ওঠবার সময় আলফ্রেডের কাছে একটি তরুণী এল হিসেব নিয়ে। বোধ হয় তখনো সে কিছু পাবে। তরুণী ঐ দোকানেরই একজন।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও রঙ্গপ্রিয় সে। দুটি গালে যেন গোলাপ ফুটেছে। অথচ প্রসাধনের কোনো ধার দিয়েই সে যায়নি।

আলফ্রেডের কাছে প্রস্তাব করলাম, এর একটা ছবি নিলে কি হয়?

আলফ্রেড সেকথা জার্মান ভাষায় তাকে জানালেন।

তরুণীটির কী আনন্দ!

একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। আধো আধো ইংরেজী ভাষায় নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে, মি?

বললাম, ইয়েস।

তখনি তরুণীটি রাজী হয়ে গেল। হিসেবের খাতা মাটিতে নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিকাল তখন ছটা। এক পাশে পাহাড়, আর এক পাশে লুসার্ন হ্রদ। মাঝখানে রাস্তা। সেই মনোরম রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে এসে উঠলাম।

হোটেল তো হোটেল! পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ হোটেলের সমকক্ষ। হোটেলের এত বড় বাড়ি আমি আর দেখিনি। একটা চারতলার সমান পাহাড়ের উপর এই ছ-তলা অট্টালিকার গঠনকার্য। আর আমার ঘর হল সেই শেষ উপরতলায়—একেবারে ছাদের নিচে।

লিফ্‌টে করে উঠে ঘরে পৌঁছে যখন নিচের মাটির দিকে তাকালাম—সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসতে হল। জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালে—সাহস বলে কিছু থাকে না। লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার পক্ষে স্থানটি অব্যর্থ। নিচের মানুষগুলো যেন ছোট ছোট পুতুল হয়ে বেড়াচ্ছে। আর উপরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিশ্চয় দেবলোকের অধিবাসী। দেবলোকে থাকার সুবিধা এই যে, মরবার ভয় নেই। যাঁরা দেবতা—অমৃতভাণ্ডের অধিকারী, তাঁদের জন্যই দেবলোক। কিন্তু মরলোকের মানুষ হয়ে—দুটি অন্নের কাঙাল—কী অধিকারে আমি এই দেবলোকে থাকতে পারি? হার্ট যদি কারও দুর্বল থাকে, হলফ করে বলতে পারি, এ ঘরের জানালা খুলে দাঁড়ালে তার আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আমার হার্ট যে ইতিমধ্যে এত সবল হয়েছে, এটা ঠিক জানা ছিল না। সবল নিশ্চয় হয়েছে, নইলে এমন পরীক্ষাস্থলে এসে না মরে জানালাটাকে বন্ধ করে দিলাম কেমন করে?

কিন্তু বন্ধ করলে তো চলবে না। যাকে বন্ধ করতে যাব সে তো বন্ধনের নয়, মুক্তির। জানালাটার একটা অনন্যসাধারণ আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। নিচের দিকে না চাইলেই হল। নিচের দিকে না চেয়ে জানালাটা খুলে রাখবার অরোধ্য এক প্রয়োজন স্বীকার করলাম। সোজা চেয়ে থাকো। তাহলেও পূর্ণতা। অসীমের

এই বিশ্বরূপ জীবনে আর দেখিনি। সৌন্দর্যের এই নয়নানন্দকর মূর্তি আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। সামনেই হ্রদ। ব্রুনেনের লুসার্ন হ্রদ। মানস সরোবরে যাইনি, চাক্ষুষ দেখিনি তাকে। দেখেছি অবশ্য বুদ্ধ বসুর 'কৈলাস ও মানস সরোবর' ছবিতে—সেও বহুদিন আগে। সে-সব স্মৃতি এর কাছে ম্লান হয়ে গেল। এ হ্রদের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ—জানি না। দুপাশে অপূর্ব পাহাড়—পাহাড়ের মাথা গিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে আকাশে। মাঝখানে নদীর মতো হ্রদটি বিরাজমান। পাহাড়ের উপর আবার বাড়ি। সে-সব বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতির উজ্জ্বল স্বাচ্ছন্দ্য। কমনীয় আলোর কাঞ্চন-বন্যা। পাহাড়ের এক পাশ থেকে পড়ন্ত দিবালোকের নিরুপম দীপ্তি! তাতে জলের শোভা বেড়েছে বৈ কমেনি। মাঝে মাঝে জল কেটে কেটে দ্রুত চলে যাচ্ছে মোটর লঞ্চ, ছোট স্টীমার।

সুইটজারল্যাণ্ডের হৃৎপিণ্ড থেকে উত্থিত সে এক অপূর্ব উপভোগ—অপরূপ রোমাঞ্চ!

ক্যামেরাটায় নতুন ফিল্ম্ ভরে নিলাম। আজ নয়, আগামীকাল সকালবেলা ছবি তুলতে হবে।

আমার দেখাই তো সব নয়! অপরের দৃষ্টিপ্রদীপও জ্বালাতে হবে। আমার এ আলোর ছোঁয়া পেয়ে শত শত বর্তিকা যদি না জ্বলে ওঠে—তবে আর আনন্দ কই?

তারই জন্য তো আগামীকালের প্রত্যূষ—আগামীকালের প্রস্তুতি!

সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার খেতে নামলাম। একেবারে নিচেরতলায়।

দেড় ঘণ্টা লাগল খাওয়া শেষ করে উঠতে। জলের বদলে লেমনেড খেতে হল গাঁটের পয়সা খরচ করে।

আলফ্রেড খাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—পরে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

খেয়ে উঠে তাই গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তিনি তখন বসে ছিলেন হোটেলের বার-এ। সেখানে রীতিমতো একটা নাইট ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছে।

আমাকে দেখে আলফ্রেড খুশি হলেন। আরো খুশি হলেন, যখন দেখলেন আমি একটা পাঁট নিয়ে বসেছি—বিয়ারের। গতকাল বেচারা অনেক করে উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ তাঁর কথামতো চলতে পেরেছি দেখে তাঁর আনন্দের শেষ রইল না।

অনেকে সিগারেট বিতরণ করল। ধরাতে হল।

আলফ্রেড করমর্দন করলেন।—এই তো চাই! হ্যাভ্ এ গুড জব্! যেখানে যেমন···

তারপর লোকজনদের শুনিয়ে—দেখিয়ে বললেন, কেমন লাগছে? কী রকম সুন্দর সিগারেট টানছে এ দেখছ? সব পারবে। পারবে না কেন? না পারার কী আছে?

একজন প্রিয়দর্শন জার্মান ভদ্রলোক পিয়ানো বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছেন। মুখের সামনে তাঁর মাইক। গলাটি ভালো। আলফ্রেড বারবার তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, আর একখানা হোক। এবার একটা ইংরেজী।

ভদ্রলোক অনুরোধ রক্ষা করে যেতে লাগলেন। আর গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাততালির চোট!

মিস কটন আর মিস জোনস কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল।

আলফ্রেড বললেন, ওদের দেখছি না যে!

পেগের বাকী মদটুকু শেষ করে আলফ্রেড ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই দেখি, দুটি যুবতীকে আলফ্রেড কোথা থেকে ধরে এনেছেন।

পাশে একটা আসন খালি ছিল।

মিস কটন এসে বসল। মিস জোনস বসল কিছুটা তফাতে।

আলফ্রেড ওদের জন্য অর্ডার দিলেন উগ্র মদের।

মিস কটনও খাবে না। আলফ্রেডও ছাড়বেন না।

আলফ্রেডের অগোচরে মিস কটন আমার পাত্রে কিছুটা চালান করে দিল।

এক বোতল বিয়ার খাবার পর আমার এমন অবস্থা ছিল না যে ফের ঐ উগ্র মদটাকে গলাধঃকরণ করি। দু চামচে নিজের জন্য রেখে বাকীটা ফের মিস কটনের পাত্রে ঢেলে দিলাম।

ব্যাপারটা আলফ্রেডের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি রীতিমতো রেগে উঠলেন।—এটা খুব অন্যায় করলে তুমি।

অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বলতে লাগলেন, অল্প অল্প করে খেতে পারতে। তাই বলে আর একজনের পাত্রে ঢেলে দিতে পার না। এটা এদেশের শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

আলফ্রেড মিস জোনস্‌কে নিয়ে নাচতে চলে গেলেন আসরে। বলনাচ।

আমার অবস্থা দেখে কটনের হয়তো দয়া হল। কানের কাছে মুখ এনে সে চুপিচুপি বললে, এই সব জ্বালাতন সহ্য করতে হবে বলেই পালিয়ে গিয়েছিলাম। হ্রদের ধারে বেড়াচ্ছিলাম। আলফ্রেড গিয়ে ধরে আনল। যাই হোক, তোমায় বাকীটুকু খেতে

হবে না। সরিয়ে রাখো। অত ভাবনা কিসের? অত বোকা কেন তুমি?

মদে চুর হয়ে সব গান আর বলনাচ শুরু করে দিল। কি ভাগ্যি, এ অধম ওসব রসে বঞ্চিত! নইলে আমারও পরিত্রাণ ছিল না।

অন্যান্য দলেরও বহু মহিলা ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। তাদের খরদৃষ্টির শরবিদ্ধ অবস্থায় নিজেকে কেমন নিরুপায় বোধ করছিলাম।

রাত বারোটার সময় বললাম, আমার ঘুম পাচ্ছে। লেডিস এণ্ড জেণ্টেলমেন, গুড্ নাইট।

শুভরাত্রি জানিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। কাঠের সিঁড়ি। তার উপর দামী কার্পেট। জুতোর শব্দ ওঠে না।

তিনতলার উপর তিনটি মেয়ে বসে ছিল। একজনের জিম্মায় আমার ঘর। ছতলার উপর। সে মেয়েটিও সেখানে বর্তমান। প্রথম ঘরে ঢোকবার সময় তার সাহায্য নিয়েছিলাম: টয়লেট রুম কোথায়?

সে দেখিয়ে দিয়েছিল।

এখন, এত রাত্রে ফের মেয়েটিকে দেখলাম। কী সরল মুখশ্রী! চোখ দুটিতে কী আশ্চর্য কমনীয়তা! নগ্ন দুখানি বাহুতে কী লাবণ্যের বিদ্যুচ্ছটা!

সে তন্ময় হয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল। কৌতূহল প্রকাশ করছিল তার সঙ্গিনীদের কাছে। হতে পারে, এ কল্পনার পিছনে আমার আপন মনের মাধুরীটুকুই দায়ী। তবু, নিজের পোশাকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ভুললাম না। বার্টনের স্যুট···নাইলনের শার্ট···কম কি?

ঘরে ঢুকে শুধু একবার কলিং বেল টেপার অপেক্ষা···

তার পরের কথা ভাবতেও শরীরে রোমাঞ্চ আসে!

হয়তো অনেক কিছুই হবে। নয়তো, কিছুই হবে না···

তবু, মেয়েটিকে দেখে মনে হল, সে আমাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পেরেছে। আমি যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কোনো কাজ করতে পারি, স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে না। তাই তার বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখা যে কোনো ভদ্র ব্যক্তিরই কর্তব্য! সেকথা ভেবে আমিও মুক্তি পেলাম। আজ রাতের মতো আমার জীবন থেকে তাকেও মুক্তি দিলাম।

সাপের মতো দেহটাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিলাম।

শোবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, প্রত্যেকের ঘরের রুদ্ধ দরজার সামনে এক জোড়া করে জুতো। এই জুতো নাকি এরা পাবে আগামীকাল সকালবেলা পালিশ করা অবস্থায়।

আমার জুতোর পালিশ না হয় নিজের হাতেই করলাম।

দরজাটাকে বন্ধ করে বিছানার উপর এলিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রথম কাজ হল—জানালা থেকে হ্রদের ছবি নেওয়া।

দুখানা ছবি তুললাম পর-পর। হ্রদের উপর একটু একটু কুয়াশার আভাস। কিন্তু পাহাড়ের আড়ালে সূর্য উঠছে। তরুণ অরুণের রক্ত-আলোয় উদ্ভাসিত পার্বত্য দিগন্ত। অসংখ্য রশ্মিশর ছড়িয়ে পড়তে চাইছে যেন একটা আবদ্ধ ঘরের চাল ফুঁড়ে। চমৎকার দৃশ্য। জলের উপর দুখানা মোটর-লঞ্চ সাঁ সাঁ শব্দ করে এগিয়ে চলেছে। নির্বাক পাহাড় যেন সবাক হবার সাধনায় তন্ময়।

ব্রেকফাস্ট করতে নিচে যেতে হবে। লিফ্‌টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে আবার অটোমেটিক লিফ্‌ট। যিনি চড়বেন, তিনিই চালাবেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে ঠিক পরিচিত ছিলাম না। কোন্ বোতামটা টিপতে কোন্‌টা আবার টিপে বসব। শেষে কি বিপত্তি হবে!

আশা ছিল, কারো সঙ্গে হয়তো যেতে পারব। কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না, যিনি আমাকে সাহায্য করতে সচেষ্ট। অবশেষে পেলাম সেই মেয়েটিকে—কর্তব্য সাধনের জন্য যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য। যার জিম্মায় আমার এই ঘর। আমার নিরাপত্তা। এ হোটেলে আমার সুখ-শান্তি। প্রথম ঘর চেনাবার ব্যাপারে যে সুন্দরী মেয়েটির স্বচ্ছন্দ সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

একরাশ কাচা চাদরের বোঝা নিয়ে সে লিফ্‌ট থেকে বেরোতেই তাকে ধরলাম। বললাম, গুড্ মর্নিং।

গুটেন মর্গন।

লিফ্‌টম্যান কোথায় গেল?—ইংরেজীতে প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটি মৃদু হেসে কপালকুণ্ডলার মতো তাকিয়ে রইল। ইংরেজী সে বোঝে, দেখলাম। ইংরেজীতেই বললে, নিচে যেতে চাও ?

হ্যাঁ।

লিফটে ঢুকে পড়ো। বলে দিচ্ছি, কোন্ বোতামটা আগে টিপবে।

কণ্ঠস্বর যেন তার মধুবর্ষী।

আমাকে জোর করে মেয়েটি খাঁচার মধ্যে নামিয়ে দিল।

কিন্তু যদি মরি, একা মরব কেন ? আমিও তাকে জোর করে খাঁচার মধ্যে নামিয়ে নিলাম। বললাম, বোতামের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। যদি আমাকে একা নামতে হয়, লিফ্‌টে না নেমে সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারি।

মেয়েটির কী হাসি! হাসতে হাসতে সে প্রায় ঢলে পড়ে। বললে, তুমি দাঁড়াও। আমি বিছানার চাদরের বোঝাটা ঘরে রেখে আসছি।

দৌড়ে রেখে সে ফের ফিরে এল। ইতিমধ্যে লিফ্‌ট ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভিতরে থাকায় যদি কিছু অসুবিধা ঘটে !

এবার যুগলে মিলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মেয়েটি লিফ্‌টের দরজা বন্ধ করে একটা বোতাম টিপল।

লিফ্‌ট নিচে নামতে লাগল। মেয়েটি বললে, এই বোতামটা টিপবে—নিচে নামবার সময়।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

ঘটাং করে এক সময় লিফ্‌ট নিচে এসে থেমে গেল।

মেয়েটি দরজা খুলে বললে, বিট-ই (প্লীজ)।

বিহ্বলের মতো বেরিয়ে এলাম।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে যখন বসলাম, ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

কদিন পরে আজ বিশ্রাম। তাই বেলায় ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা হয়েছিল।

গিয়েছিলাম অত্যন্ত শাদাসিধে পোশাকে। সিল্কের শার্ট, কালো রঙের ফুল প্যান্ট আর পামশু পরে। মোজা নয়। জ্যাকেট নয়। তাই দেখে তো আলফ্রেড অবাক।—হ্যাভ এ গুড্ জব! কে বিয়ে করবে বলো।

মেয়েরা সস্নেহ দৃষ্টিতে চাইল।

আলফ্রেড বললেন, রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো ভালো?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

এবার মিস কটনের প্রতি আলফ্রেডের কটাক্ষ: তুমি কেমন ঘুমিয়েছিলে রাত্রে?

তু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।—মিস কটনের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর।

কেন, কেন?—আলফ্রেডের প্রশ্ন উৎকণ্ঠ।

সমস্ত রাত তুঃস্বপ্ন দেখেছি।

কী রকম, কী রকম?

মনে হয়েছে—মিস কটন বললে, বারবার মনে হয়েছে, কে যেন দরজায় করাঘাত করছে। একটা দৈত্যের মতো তার গলার আওয়াজ। গলার আওয়াজে একটা বিকট, বিকৃত আস্ফালন!

তাই নাকি? ভারি আশ্চর্য তো! সেটা কার গলার আওয়াজ বলে মনে হয়?

কার আর? হয়তো তোমারই!

একটা উচ্চহাস্যের কলরোল উঠল ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

পরিহাসটুকু লক্ষ্য করবার মতো।

আলফ্রেড রইলেন মুখ কাঁচুমাচু করে বসে মুহূর্তকয়েক। কি, ভেবে নিলেন কী বলবেন। তারপরই শব্দবাণ ছুঁড়লেন একটা: হয়তো ঐটাই তুমি কামনা করেছিলে মনেপ্রাণে! সময়ে

বিয়ে না করলে রাত্রে ঐসব কুচিন্তার শিকার হতে হয়। যে বয়সে যা....

কিন্তু আমার কথা তো শেষ হয়নি।—

মিস কটন যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যুদ্ধে সে হারবে না। বললে, তুমি প্রশ্ন করেছ, আমি কেমন ঘুমিয়েছিলাম রাত্রে। আমি তারই জবাবে ঐটুকু বলেছি। এখনো আমার কথা বাকী থাকতে পারে তো! তাছাড়া এ দুঃস্বপ্ন। আমার কথা হতে যাবে কেন?

বেশ সখি, বলো···

মিস কটন বলতে লাগল, দৈত্যটা করাঘাত করেই শুধু যেন ক্ষান্ত হল না। তার পরদিনই এমন কাণ্ড বাধাল যাতে নাকি দলের লোকদের বলতে বাধ্য করা হল, মেয়েটিকে নামিয়ে দেওয়া হোক মাঝপথে। দুঃস্বপ্নটা কি ভীষণ দেখো! কোরিয়ারের সাতখুন মাপ, অথচ যে অসহায় মেয়েটি পয়সা দিয়ে লণ্ডন থেকে বেড়াতে বেরিয়েছে, রক্ষক ভক্ষক হওয়ার ফলে, সে আর মাপ পেল না। নেমেই গেল। কিন্তু সব মেয়ে তো আর সমান নয়। সে তখন লণ্ডনে ফিরে গিয়ে কোম্পানীর অফিসে দেখা করল। কোরিয়ারের চরিত্রকে চ্যালেঞ্জ করল। কোম্পানী গোপনে সি আই ডি নিযুক্ত করল। আর অপর একটি সুন্দরী মেয়েকে পরের ট্রিপে পাঠাল।

তারপর?

আলফ্রেড যেন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

তারপর?—মিস কটনের মুখের হাসি উথলে পড়ল জুঁইফুলের মতো দাঁতের সারিতে: তারপর, নিজের স্বভাবের জন্যে আলফ্রেডের জেল হয়ে গেল। আলফ্রেডের চাকরি গেল।

আলফ্রেডের জেল হয়ে গেলে আর চাকরি গেলেই বোধ হয় ব্যক্তিগতভাবে তুমি বেশি খুশি হও—মানে হচ্ছে। বেশ চমৎকার গল্পটা বানিয়ে রেখেছ·যা হোক, সারা রাত না ঘুমিয়ে। কিন্তু একটা কথা। দৈত্যের অত্যাচারে যে মেয়েটি মাঝপথে নেমে যেতে বাধ্য

হয়েছিল, তার সঙ্গে কি আর কোনো মেয়ে থাকত রাত্রে এক ঘরে ?

না।

তোমার ঘরে মিস জোন্‌স্ থাকে তো নিয়মিত ?

থাকে।

গত রাত্রেও ছিল ?

ছিল বৈকি !

মিস কটন মুহূর্তকাল থামল। থেমে বললে, তাকেই তো সি আই ডি নিযুক্ত করেছে কোম্পানী—তোমাকে ধরবার জন্যে !

আবার একটা হাসির ধুম পড়ল ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

ব্রেকফাস্ট সেরে ঘরে গেলাম। ভালো করে সাজসজ্জা সেরে নিচে নামলাম সিঁড়ি ভেঙে। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে ঘরের চাবি জমা রেখে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। পেলাম নিজেদের দলের কয়েকজনকে।

হোটেলের দরজায় একদল তরুণীর দর্শনলাভ ঘটল।

কেউ আসছে নিউ ইয়র্ক থেকে। কেউ ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, সুইডেন, ইতালি, ডেনমার্ক, কি পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকে।

প্রত্যেকটি তরুণীর মধ্যেই কী আশ্চর্য রকমের প্রাণবন্যা !

একটি তরুণী তো সরাসরি প্রশ্নই করে বসল আমাকে : তুমি কোথাকার লোক ?

ইণ্ডিয়ার। থাকি কলকাতায়।

তুমি লণ্ডন থেকে আসছ ?

হ্যাঁ।

আমেরিকায় যাবে না ? লণ্ডনে এসেছ অথচ আমেরিকা দেখবে না ? দেখবে না নিউ ইয়র্ক ?

কী উত্তর দেব—ভেবে পেলাম না। কলকাতার কোনো একটি অফিসের সামান্যতম কর্মচারী। সেখানকার একটি মাত্র ভাড়াটে ঘর হচ্ছে আমার সাম্রাজ্য। চাকরি যদি যায়, তার পরদিন কি করব জানি না। আমি দেখব নিউ ইয়র্ক? লণ্ডনে যে আসতে পেরেছি—এই তো আমার ভাগ্য!

বললাম, চেষ্টা করব।

না, না, তোমাকে যেতেই হবে।

মেয়েটি অনুরোধে বিনম্র হয়ে পড়ল। যেন অনুরোধ করলেই আমার যাওয়া সম্ভব হবে।

বেলা দশটা। হ্রদের ধারে বেড়াতে গেলাম। হ্রদের তীরে ঘন বৃক্ষবিটপী। বসবার বেঞ্চ। সবগুলি ভর্তি। ঘাটের ধারে গোলাকার লোহার রেলিঙ। মাঝে মাঝে রোদ ওঠে। মাঝে মাঝে আবার মেঘলা করে। হ্রদের উপর দিয়ে বুনো বক উড়ে যাচ্ছে। জলে হাঁস চরছে। হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়। যেমন পুরুষ, তেমনি স্ত্রীলোক। দূরে পাহাড়ের সঙ্কেত।

এ-ফুটপথ থেকে ও-ফুটপথে গেলাম। সুন্দর সুন্দর সব দোকান। এত রকমের রঙিন, সচিত্র কার্ড বিক্রি হচ্ছে যে দেখলে মনে হয় সবগুলো কিনে নিয়ে বাড়ি যাই। বিক্রি হচ্ছে কাপড়, খেলনা, ক্যামেরা, ফিল্ম, গয়না, ঘড়ি। ঘড়ি আবার কত রকমের! একটা ক্লক ঘড়ির পেনডুলামে একটা পুতুল আটকানো। পেনডুলাম দুলছে, কী পুতুলটা, বোঝা কঠিন।

একটা গির্জার ধারে প্রার্থনা শুরু হয়েছে। এত লোক দাঁড়িয়েছে যে সকলের আবার ভিতরে জায়গা হয় না। কিছু লোক রাস্তায় এসে পড়েছে।

সকলেরই মনোকষ্ট—এত ভালো ভালো জিনিস দেখে কেনবার উপায় নেই। তীর্থস্থানে দাম সব জিনিসেরই বেশি। এত পয়সা কেউ সঙ্গে আনেনি যাতে সে খুশি হবার মতো জিনিস কিনে নিয়ে

যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাস্টাম্‌সের বেড়া। সে বেড়া পেরিয়ে, গ্যাষ্য ডিউটি দিয়ে কেউ জিনিস নিয়ে যেতে রাজী নয়।

এই সব আলোচনা করতে করতে আমি, পিটার, বেথেল আর মিচেল একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম।

একটা খালের মতো জায়গায় এসে কজনে দাঁড়ালাম। সামনে জলের কল। আশেপাশে বাগান। খালের ধারে লোহার বেড়া। জলের খানিকটা অংশ অবধি একটা কাঠের সেতু।

বেলা তখন এগারটা।

পিপাসা পেয়েছিল। একটা রেস্তরাঁর খোলা-এলাকায় গিয়ে বসা হল। নিলাম কফি। ওরা নিল মদ। আলফ্রেড—আগেই গিয়ে বসেছিলেন। খানিকটা শূকরের মাংস নিয়ে রুটির সঙ্গে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন। চেহারাটা তো মোটা। কাজেই তাঁর ক্ষুধাটাও প্রবল। এক গেলাস বিয়ার নিয়ে চোঁ চোঁ করে শরবতের মতো মেরে দিলেন। ক্ষুধানল নির্বাপিত কববার জন্য আরো কি কি যেন খেলেন। হোটেলের মেয়েকে পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলালেন।

এদিকে পিটারের অন্যমনস্কতার দরুন নড়বড়ে টেবিলটা গেল উল্টে। টেবিলের উপর মদ ছিল। পড়ল তো পড়ল, আমার প্যান্টকে ভিজিয়ে ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়ল। এত রাগ হতে লাগল, কি বলব! মনে হল, ছাপাখানায় কাজ করে। এর বেশি আর ও কি পারবে?

পিটার বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। বলতে লাগল, সরি, ভেরি সরি···

তার দুঃখ প্রকাশের সমস্ত অর্থ তখন আমার কাছে নিরর্থক।

বারটায় লাঞ্চ। তার আগেই হোটেলের পথে দৌড়তে হল। আকাশে মেঘ উঠেছিল। সহসা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

এখানে কখন রোদ আর কখন বৃষ্টি, বলা কঠিন। গতকাল সন্ধ্যাটা ভালো দেখেছিলাম। রাত্রে নাকি ঝিমঝিমে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

লাঞ্চ খাবার সময় মিচেল একটা ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অদূরে একটা ইতালীয় পরিবার খেতে বসেছিল। তারা বাঁ হাতে ধরেছে কাঁটা। ডান হাতে ছুরি। ঠিকই ধরেছে ইংরেজের মতো। কিন্তু মুখে তোলবার সময় কাঁটাটাকে হাতবদল করছে। অর্থাৎ তখন ডান হাতে আসছে কাঁটা। বাঁ হাতে ছুরি।

এমনিধারা নাকি খায় আমেরিকানরা পর্যন্ত।

মিচেল বললে, কেমন ব্যাপার দেখছ?

বললাম, এতে তো সময় যায় বেশি। তার চেয়ে ইংরেজের খাওয়ার প্রণালী ভালো।

তাই কি তোমার মনে হয়?

তাই তো মনে হয়।

ইংরেজ মিচেল তাদের একজন ভারতীয় সমর্থক পেয়ে বুঝি খুশি হল।

তখনো খাওয়া শেষ হয়নি ; আলফ্রেড এসে কানে কানে বললেন, ঠিক একটার সময় বেরোতে হবে—মনে রেখো। তার আগে লাউঞ্জে জমা হবে। এক্‌স্‌কারশনে যেতে হবে।

একটাতেই বেরোবার চেষ্টা করেছিলাম। টয়লেট রুমে ঢুকতে হল। লাউঞ্জে আসতে একটা পাঁচ হয়ে গেল।

আলফ্রেড অসহ্য প্রতীক্ষায় আমার জন্য বসে ছিলেন। আমাকে দেখেই ফেটে পড়লেন : তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি! ঘড়ি ধরে কাজ করতে পার না? কোথায় একটার সময় বেরোবার কথা—আর আসছ একটা পাঁচে? ওদিকে তোমার জন্যে এত লোক আটকে আছে? সময় হচ্ছে আমার টাকা। পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করতে হয়। এতক্ষণ কি করছিলে তুমি?

পেটটা ব্যথা করছিল। তাই···

আগে সারতে কি হয়েছিল? মোটরলঞ্চ ভাড়া করে রেখে দিয়েছি—তোমার জন্যে সে দাঁড়াবে? তার সময়ের দাম নেই? গুনগার দেবে—তুমি?

একেবারে যাচ্ছেতাই করতে করতে তিনি আমাকে নিয়ে বেরোলেন।

হোটেলের বাইরে গিয়ে দেখি, আমি ছাড়া সকলেই অপেক্ষা করছে।

আমাকে দেখে সকলে ঘাটের দিকে এগিয়ে চলল।

লঞ্চ তৈরিই ছিল। সকলে উঠে পড়েছিল। আমি আর আলফ্রেড এসে উঠতেই ওটা ছেড়ে দিল।

সকলে একধার থেকে জিগ্যেস করতে লাগল, তোমার এত দেরি হল কেন?

বললাম, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল।

এখন কেমন ?

খুব গরম লাগছে।

সত্যিই গরম লাগছিল। গা হাত জ্বালা করছিল। জলের উপর এমন গরম লাগতে পারে জানতাম না।

মিসেস ক্যানাডি পিপারমেণ্ট লজেন্সের একটা ফাইল বার করে আমার হাতে দিয়ে দিল। বললে, মুখে ফেলে রাখো। আরাম পাবে।

মিস কটন বললে, জ্যাকেটটা খুলে বোসো।

মিসেস জেবসন একটা সেন্টের শিশি বার করে আমার হাতে গুঁজে দিল। বললে, ঢালো। খানিকটা ঢেলে ফেলো জামার উপর।

মিঃ বেথেল একটা সিগারেট দিয়ে বললে, টানো।

সকলকার কথামতোই কাজ করলাম। পিপারমেণ্ট লজেন্স মুখে দিলাম। জ্যাকেট খুলে ফেললাম। সেন্টের শিশি উজাড় করলাম জামার উপর। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম।

আলফ্রেড বসে ছিলেন ছাউনির বাইরে। হেঁকে জিগ্যেস করলেন, কেমন লাগছে এখন ?

বললাম, ভালো হয়ে গিয়েছি।

নিশ্চয় ভালো হবে। কেন হবে না ?

আলফ্রেডের মাথার উপর দায়। তাঁকে তো উৎসাহ দিতেই হবে।

পিটার বললে, তুমি এক কাজ করতে পারো। ফাঁকে গিয়ে বসতে পারো। হাওয়া পাবে।

তাই যাই।—ফাঁকে এসে জমিয়ে বসলাম। পাশে মিস কটন। বিপরীত দিকে মিস জোনস্, আলফ্রেড, আর একটি ছেলে।

ছেলেটি আমাদের কেউ নয়। যার মোটর লঞ্চ—তার কেউ হবে।

ছেলেটিকে প্রত্যেকে একটা করে পেনি দিতে লাগল। সুইটজারল্যাণ্ডের টাকা-পয়সা অন্যরকম। পেনিগুলি ছেলেটির চোখে বোধ হয় নূতন। তাই সে আগ্রহের সঙ্গে অনেকগুলি পেনি নিয়ে বারবার দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে পকেটে পোরে, আবার বার করে। দেখে—আবার পকেটে পোরে। জগতে সব ছেলেমানুষরাই সমান।

আলফ্রেডের একটি মাউথ অর্গান ছিল। অন্যান্য স্থানে অনেকবার বাজিয়েছেন। এখন ফের তিনি সেটা বার করে বাজিয়ে চললেন। আর তার সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল মিস কর্টন, মিস জোনস, আরো অনেকে।

যাত্রাটা খুব উপভোগ্য—সন্দেহ ছিল না। কেউ গল্প করছে, কেউ ছবি তুলছে, কেউ গান গাইছে।

আকাশে কখনো আলো, কখনো ছায়া। আমাদের দেশের শরৎকালের মতো। জলের উপর তার আভাস ইঙ্গিত।

সাঁ সাঁ শব্দে মোটর লঞ্চ এগোচ্ছে।

দুপাশেই গগনচুম্বী পাহাড়। পাহাড়ে অসংখ্য গাছগাছড়া। কোথাও হ্রদের পাশেই কাঠের বাড়ি। একটা বাড়িতে শুনলাম, ব্রুনেনের মন্ত্রী থাকেন। বাড়িটার রঙ পিঙ্গল। কাঠের বাড়ি হলেও কারুকার্য তার অদ্ভুত। কোথাও দু-তিনটে ছেলে কসটিউম পরে চান করে গা মুছছে। হয়তো পিকনিক করতে এসেছিল তারা হ্রদের তীরে। কেউ অথবা কারা ছিপ ফেলে বসে আছে। মাছ ধরতে এসেছে। কোথাও কুঞ্জবনের মতো ঝোপঝাপ। স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকার উপভোগস্থল। কোথাও আবার একটা ছোট বুনো নৌকো—গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। নৌকোর গায়ে খড়ি দিয়ে আঁকা একটা অস্ত্রের চেহারা। নয়তো চোখ।

আলফ্রেড এইসব জায়গা অতিক্রম করবার কালে পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে উলুধ্বনি করতে লাগলেন।

জিগ্যেস করলাম, কি ব্যাপার ?

শুনলাম, এইসব পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে নাকি অনার্য জাতীয় এক রকমের মানুষ থাকে। তাদের বলে 'ইণ্ডিয়ান'। যাদের খেলা দেখানো হয়েছিল সেণ্ট এণ্টনের হোটেলে। এরা সহজে বাইরে আসে না। জঙ্গলের মধ্যেই এদের ঘর। এদের সংসার।

দুঃখের বিষয়, আমি একটিও 'ইণ্ডিয়ানকে' দেখতে পেলাম না।

প্রায় দুঘণ্টার হ্রদ ভ্রমণ শেষ করে উঠলাম এসে একটা রেল-স্টেশনে। তখনো হ্রদ শেষ হয়নি। আরো কতদূর গিয়েছে, কে জানে! আর একে যদি হ্রদ বলা হয়, নদী বলব কাকে বুঝতে পারলাম না। হ্রদের নাম, লুসার্ন।

রেল-স্টেশনে চা, কফি ও মদ্যপানের রেস্তরাঁ আছে। টিকিট-ঘর আছে। দলপতি আলফ্রেড টিকিট কেটে আনলেন। তারপর বললেন, চলো, ট্রেনে চড়তে হবে।

ট্রেন আর লাইন দেখে মাথা ঘুরে গেল। আমার বাপ চৌদ্দ-পুরুষ এ অবস্থায় কোনোদিন এসেছিলেন কিনা জানি না। এ লাইনে কেমন করে ট্রেন উঠবে বুঝতে পারলাম না।

তিন হাজার ছ'শত উনআশী ফুট উর্ধ্বে পাহাড়ের আঙিনা। মাটি থেকে খাড়া লাইন চলে গিয়েছে উপরে। এত উপরে যে নিচে থেকে চাইলে দেখা যায় না। আশেপাশে বনজঙ্গল, বড়য় ছোটয় মিলিয়ে হাজার রকমের গাছ, নিচে হ্রদ আর অসংখ্য পাহাড়ের স্তূপ।

সেই লাইন দিয়েও শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন উঠতে লাগল স্বাভাবিক অবস্থায়। মানুষের অসাধ্য আর কী রইল জানি না। যত উঁচুতে এগোতে লাগলাম, ক্ষণে ক্ষণে মনে হতে লাগল, এইবার বুঝি বিকট শব্দ করে একেবারে নিচে গিয়ে পড়বে ট্রেনটা আর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে এই ছ-ছটা বগী। আমরা তালগোল পাকিয়ে ঢেলার মতো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব। কিন্তু দেখলাম, না। অত সহজ নয়। দিনের মধ্যে এরকম অনেকবার এ ট্রেন ওঠা-

নামা করে। করছে। করবে। কিন্তু ভয় করে নিঃসন্দেহে। বাইরের দিকে চাইলে মনে হয় যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েছি। ঘোড়া নিয়ে চলেছে মর্ত্য থেকে স্বর্গে। একটা অদ্ভুত থ্রিল!

যখন তিন হাজার ছ'শত উনআশী ফুট উঁচুতে গিয়ে হাজির হলাম, ধড়ে প্রাণ এল। তিন ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত। বিকেল ছটায় নামবার গাড়ি।

জায়গাটার নাম হচ্ছে—বারজেনেস্টক বান। একটি ছোটখাটো শহরের মতো। সকলে মিলে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে উঠলাম। কেউ অর্ডার দিল মদের। কেউ কফির! শেষোক্তটির পক্ষে ছিল আমার আবেদন। আমাদের হোটেলের নাম হল, রেস্টুরেণ্ট পার্ক হোটেল। যখন কফির মধ্যে চিনি ফেলে চামচে নাড়ছি, বৃষ্টি শুরু হল। অদূরে একটা ফোয়ারা। তা থেকে অনবরত জল উৎসারিত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টি আর ফোয়ারার জল যখন এক হয়ে মিশে গেল—সে সৌন্দর্য সত্যিই উপভোগ করবার। মিনিট পনেরো পরে বৃষ্টি ধরে গেল। ফোয়ারার জল কিন্তু অব্যাহত হয়ে ঝরে পড়েছে। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে যে যার পথ তৈরি করে নিলাম। নিজের নিজের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখন দু'ঘণ্টার উপর সময় আছে হাতে। প্রচুর সময়।

একটি ছাউনির মধ্যে ঢুকলাম। ছাউনি থেকে লক্ষ্য করলাম, বাইরে ধোঁয়ার মতো তুষার উড়ছে। প্রচুর ল্যাম্পপোস্ট। ল্যাম্প-পোস্টের আলোর পাত্রগুলি ভারি সুন্দর। চারিধারে তৃণাচ্ছাদিত জমি। গাছ, বসবার বহু বেঞ্চ। বেঞ্চগুলির রঙ টাটকা ঘাসের মতো। গাছ, জমি আর বেঞ্চ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। একধারে গ্র্যাণ্ড হোটেলের পোস্টার। পোস্টার তীর এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছে—কোন্‌দিকে গ্র্যাণ্ড হোটেল। বহু টুরিস্ট, স্ত্রী এবং পুরুষ—জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, বেলজিয়াম থেকে বেড়াতে এসেছে। দলে ছোট ছোট ছেলে, এমন কি ছোট ছোট মেয়ে পর্যন্ত আছে। দেখলে

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এদের দুঃসাহস! আমাদের দেশ সমতল ভূমি। এত চড়াই উৎরাই নেই। তাতেই আমরা ছেলেমেয়েদের মনে এতটুকু অভিযানের উত্তেজনা জাগাতে পারি না, অথচ ইওরোপ আজ কী দারুণ এগিয়ে গিয়েছে! বাপ-মা আছে হয়তো রোমে, বুদাপেস্তে, স্পেনে—তাদের ন' বছরের শিশু এসেছে বেড়াতে সুইটজারল্যাণ্ডের এই উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ায়! বিষয়টি লক্ষ্য করবার মতো।

একটি দোকান দেখলাম। কী সুন্দর দোকান! প্রচুর ছবিওয়ালা কার্ড রয়েছে গ্লাসকেসে সাজানো। পত্রিকা, খেলনা, বল, কাপ-ডিশ, মোমের পুতুল, তুলোর পুতুল, তুলোর খোকা, তুলোর কুকুর—কোনো কিছুরই অভাব নেই।

দোকানদার—তিনটি মেয়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য। কালো চোখের তারা। আঙুর দোলানো মাথার চুল। অনবরতই হেসে কথা বলছে খরিদ্দারের সঙ্গে। খুব কম ইংরেজী জানে। আসল ভাষা তাদের জার্মান।

কোথা থেকে আলফ্রেড এসে হাজির হলেন।

মেয়েগুলির সঙ্গে. দিব্যি জার্মান ভাষায় কথা শুরু করে দিলেন। আমার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এ হচ্ছে ভারতীয়।

বলা বাহুল্য, আমার মতো কালো ভারতীয় ওখানে আর কেউ ছিল না।

মেয়েগুলি আগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখতে লাগল।···

আলফ্রেড বললেন, একটা কিছু কেন না।

কী কিনব?

পোস্টকার্ড কিনতে পারো। লিখে পাঠাও দেশে।

দাম তো খুব।

কত আর দাম। কিনে ফেলো।

ডাক টিকিট পাওয়া য়াবে?

এদের কাছেই পাবে।

দুখানা পোস্টকার্ড কিনতে গিয়ে পয়সা দিলাম মেয়েগুলির হাতে। তারা হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে ভাঙানি ফেরৎ দিল।

অদূরেই একটা টেবিল্ ছিল চিঠি লেখবার। সেখানে বসে দুখানা চিঠি লিখলাম। একটা শ্রদ্ধেয় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে, আর একখানা লীলাকে। লীলা কে—পরে জানাব। দুখানাতেই বাংলা হস্তাক্ষর। ঠিকানাটায় শুধু ইংরেজী···

পোস্ট করতে গিয়েই মজা বাধল।

চিঠি দুটো ওই মেয়েদের হাতেই দিতে হল। ওদের কাছে ছিল ডাক টিকিট। এয়ার মেল লেভেল।

তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার বাংলা হস্তাক্ষরের উপর। যত দেখে, তত যেন দেখবার লোভ ওদের দুরন্ত হয়ে ওঠে। আমরা নিত্য বাংলা লিখি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তার মধ্যে কী দেখবার আছে—জানি না। কিন্তু তিনটি সুন্দরী বিদেশিনীর কাছে এ ভাষারই হরফ, এ ভাষারই হস্তাক্ষর যেন পরম রমণীয় হয়ে উঠল। তারা শুধু নিজেরাই দেখল না। আরো অন্যান্য অনেককে ডেকে দেখাতে লাগল। একজন হেসে আমাকে ভাঙা ইংরেজীতে প্রশ্ন করল, এ কোন্ ভাষা?

বললাম, বাংলা।

বাংলা ভাষার চেহারা এই রকম বুঝি?

হুঁ।

কোন্ দেশে এ ভাষা বেশি চলে?

বাংলা দেশে। কলকাতায়। আরো নানা জায়গায়—যেখানে বাঙালিরা থাকে।

তুমি বাঙালি?

হ্যাঁ।

কাকে এ চিঠি লিখেছ?

যেখানা দেখাল, সেটায় ভবানীপুরের ঠিকানা।

বললাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে।

তিনি কে?

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লেখক। একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক।

তিনি কি বুড়ো?

না, বয়েস পঞ্চাশ হবে।

তিনি কি প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন?

তুমি পড়লে কেঁদে ফেলবে।

তাই নাকি?

মেয়েটির কী হাসি!—তুমিও লেখক বুঝি?

হ্যাঁ।

ওই জন্যেই লেখককে চিঠি দিচ্ছ?

হ্যাঁ।

কী লিখলে জিগ্যেস করতে পারি? যদি অবশ্য কিছু মনে না করো···

না, না, মনে করবার কি আছে? আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি।

বেশ তো। বল···

লিখলাম, তিনটি মেয়ে দেখলাম পাহাড়ের উপর। তারা মনোহারী দোকান চালায়। দোকানের চেয়েও কিন্তু মেয়ে তিনটিকে মনোহর লাগল। আমাদের দেশে তাদের দেখতে পেলে খুব আনন্দিত হব।··· কবে সে সৌভাগ্য হবে?

সত্যি, এই লিখেছ? ধন্যবাদ তোমাকে। মেয়েটি গম্ভীর হয়ে গেল: দুঃখিত, কোনোদিনই হয়তো তোমার এ সৌভাগ্য হবে না। ভারতবর্ষে আমাদের দেখতে পাবে, এ আমরা আশাই করতে পারি না। যাবার মতো আমাদের অবস্থাই নেই।

তুমি আশা না করতে পারো। আমি করব।

ধন্যবাদ। ভিতরে এসো।

মেয়েটি আমার হাত ধরে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ইংরেজ আলফ্রেডের চোখ তখন ট্যারা হয়ে গিয়েছে। একজন ভারতীয়কে এরা এত প্রশ্রয় দিতে পারে, তিনি ভাবতেই পারেননি। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।···

একদিকে ওজন হবার একটা যন্ত্র ছিল। স্থূলকায় আলফ্রেড তাতে উঠবেন কিনা ভাবতে লাগলেন হয়তো।

শুধু একা নয়—যতগুলি তরুণী ছিল, সব এগিয়ে এল আমার সামনে। হাতে তাদের খাতা। বাংলা হরফে যাতে কিছু লিখে দিই, তার জন্য তাদের ব্যাকুলতা।

আবোল-তাবোল যা-তা লিখলাম।

একজনের খাতায় লিখে দিলাম, বাঙালি কবি তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ। তুমি তার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

আর একজনের খাতায় : তোমার শীঘ্রই একজন প্রেমিক জুটবে। যদি তাকে ভালো লাগে, সুইটজারল্যাণ্ডের হ্রদে নৌকা ভাসিয়ো।

আর একজনের খাতায় রবীন্দ্রনাথের গানের খানিকটা :

> "ভোর হল যেই শ্রাবণ শর্বরী
> তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী ॥
> গন্ধ তারি রহি রহি বাদল বাতাস আনে বহি
> আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় সঞ্চরি ॥"

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা লেখবার অধিকার কোথায়? বাংলা সাহিত্য বলতে তো রবীন্দ্রনাথই পিরামিড্। রবীন্দ্রনাথই সব।

সবচেয়ে খুশি হলাম শেষোক্ত লেখাটা লিখে। রবীন্দ্রনাথের গান।

প্রস্তুত থাকলে সবগুলো খাতাতেই রবীন্দ্রনাথের গান লিখে দিতে পারতাম। সে আর হয়ে উঠল না। মনে পড়েনি আগে।

যার খাতায় গানটি লিখলাম, সে আমাকে আনন্দে আদর করতে আসে। আদর করতে আসে রবীন্দ্রনাথের গান পেয়ে নয়। অনেক-খানি লিখেছি বলে।

অন্যান্য মেয়েরা অনুযোগ করল : আমাদের খাতায় এত কম লিখলে কেন ?

বললাম, কম লিখলেও তুমি যখন মানে বুঝতে পারবে, খুশি হবে।

কী মানে শুনি ?

এক একজনকে ইংরেজীতে মানে করে শোনালাম। আর তারা জার্মান ভাষায় টপ টপ করে লিখে নিতে লাগল।

যাকে বলেছি, বাঙালি কবি তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ, সে তো হেসেই সারা। বলে, কতদিন তুমি এখানে থাকবে ?

দলের সঙ্গে এসেছি, দলের সঙ্গে চলে যাব। উত্তর দিলাম, থাকবার প্রশ্ন কই ?

তবু, তিনদিন কি পাঁচদিন থাকবে···যা হয় একটা···

কী হবে থেকে ?

বারে, তুমি লিখেছ, বাঙালি কবি তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ···তা, এক নিমেষেই মুগ্ধ হয়ে চলে যাবে ? থাকলে তো আরো আমাকে দেখতে পেতে···এ কি রকম দেখা হল তোমার ?

প্রশ্ন যে কঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

তবু বললাম, কে খেতে দিত আমাকে ?

কেন আমি ? মেয়েটির চোখের ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল।—আমি তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতাম, আমার মাকে দেখাতাম, মা ভারতীয়দের খুব পছন্দ করে। তা ছাড়া তোমায় দেখলে মা খুব খুশিই হত।

এই অধমের প্রতি তার উদারতার কারণ কি ?

সেকথা আর বলতে পারলাম না।

বললাম, আমি যে কালো।

কালোই তো ভালো। শাদা দেখে দেখে আমাদের চোখ পচে গিয়েছে। মেয়েটি বললে।

কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে। তাই চুপ করে গেলাম।

বারবার সে জিগ্যেস করতে লাগল, তুমি যা লিখেছ, সত্যি ?

মিথ্যে কথা কেন লিখতে যাব তোমার কাছে অল্প সময়ের জন্যে এসে ? আমি উত্তর দিলাম।

মেয়েটি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমায়।

যাকে বলেছি, তোমার শীঘ্রই একজন প্রেমিক জুটবে, সে ধরে নিল আমি একজন ভারতীয় জ্যোতিষী।

হাত এগিয়ে দেয় আমার চোখের সামনে, দেখ, ভালো করে দেখ একবার হাতখানা।

তোমার হাত খুব সুন্দর। ধন্যবাদ। আমি জ্যোতিষী নই।

আস্তে আস্তে তার কোমল হাতখানা নামিয়ে দিয়ে বললাম, অনুমান করে আমি লিখেছি। সত্যি হতে পারে। না-ও হতে পারে। সত্যি হলে আমার কথা মনে রেখো।

নিশ্চয় রাখব। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। মেয়েটি বললে : সত্যি না হলেও তোমায় মনে রাখব।

ধন্যবাদ। আশা করি আমার কথা যেন সত্যি হয়।

যার খাতায় রবীন্দ্রনাথের গান লিখেছি তাকে বোঝাতে একটু সময় লাগল। যখন সে সমস্তটা বুঝতে পারল, আর মানা মানল না। অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। রবীন্দ্রনাথ কে, জিগ্যেস করল। আর এত খুশি হল যে, তখন যদি তার কাছে কিছু চাইতাম, সম্ভব হলে দিতে কার্পণ্য করত না।

ওদের কাছে ডাক টিকিট ছিল। আমার দুখানা পোস্টকার্ডের

গায়ে টিকিট লাগাল। এয়ার মেলের ছোট তাপ্পি লাগাল। তারপর বললে, বেরোলেই লেটারবক্স পাবে। ফেলে দাও।

বেরিয়ে পরিত্রাণ পেলাম। মুক্ত হাওয়ায় এসে হাঁপ ছাড়লাম।···

চারিধারে ধোঁয়ার মতো তুষার হুহু করে ছড়িয়ে পড়ছে। একপাশে একটি ঝোলানো টিনের লেটারবক্স দেখলাম। গায়ে তার ক্রশ চিহ্ন। আর লেখা P T T.

তার মধ্যে দুখানা পোস্টকার্ড গলিয়ে দিলাম।

দেখা হয়ে গেল পিটারের সঙ্গে।

পিটার চলেছে আরো উঁচুতে উঠতে। যেখানে উঠেছে, সেখানে উঠে সে সন্তুষ্ট নয়। আরো—আরো উঁচুতে উঠবে।

তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম খানিকদূর অবধি। এ-হোটেল সে-হোটেলের পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তা কোথাও শুষ্ক নয়। বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। স্থানে স্থানে পথ পিচ্ছিল। চলে গিয়েছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের একেবারে শিখরচূড়ায়। সেখানে লোহার প্ল্যাটফর্ম।

অত উঁচুতে ওঠবার আগে এক জায়গায় দাঁড়ালাম। ক্রমশই উঁচুতে উঠতে হচ্ছিল বলে ক্লান্তি বোধ করছিলাম। হাঁপাচ্ছিলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলাম, তার পিছনে লোহার পাইপের রেলিঙ। রেলিঙ পার হলে আর রাস্তা নয়। একেবারে গভীর খাদ। প্রায় চার হাজার ফুট নিচু। খাদে কোথাও ঝরনা গিয়ে পড়ছে ঝরঝর ধারায়। পাশে পুকুর। সে পুকুরে অর্ধপ্রস্ফুটিত লাল শালুকের সমারোহ। একরকমের ফুল দুলছে লীলাকমলের মতো। কে জানে তাকে সানাই বলে কিনা। কুয়াশা—কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে বনজঙ্গলে। কোথাও অসমতল, বন্ধুর পার্বত্য উপত্যকা। সেখানে বিচিত্র বৈকালের রক্তিম, পাণ্ডুর ছায়ার স্তব্ধতা। একটি শীর্ণ গাছে লেগেছে ফুলের উৎসব! ফুল নয়—যেন মণি-মাণিক্য। কে জানে, সে-গাছটি ডালিম কিনা! আরো কত বিচিত্র গাছ, বিশল্যকরণী বন-সম্পদ : স্ট্র-বেরি, স্পীরেস, চেস্টনাট, এট্রোপা বেলেডোনা, বারবেরি, নার্সিসাস, ম্যাগনোলিয়া স্টীলাটা, মালবেরি, হেমলক, ল্যাভেণ্ডার।

পিটারের ইচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াবে। আকাশপ্রদীপ হয়ে হ্রদ দেখবে।

আমার জুতোর তলা ছিল রবারের। বারবার হড়কে যাচ্ছিল। আমি আর তার সঙ্গে উপরে উঠতে সাহস করলাম না।

পিটার চলে গেল।

আমি নিলাম ফিরতি পথ। ফিরে আসবার কালে দেখা হল মিস কটন আর মিস জোনসের সঙ্গে। তারা প্রশ্ন করল, প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলে নাকি?

বললাম, যাবার সাহস হয়নি।

দেখা যাক, আমাদের কি হয়।

ওরা দুজন এগিয়ে গেল। মিসেস জেবসনের সঙ্গে দেখা হল। হেসে সে জিগ্যেস করল, ফিরে আসছ নাকি?

হ্যাঁ।

জেবসন এগিয়ে গেল। কিন্তু আমি পড়লাম ভয়ানক মুশকিলে। পথ হারিয়ে ফেললাম। চারিধারে পেঁজা তুলোর মতো তুষার উড়ছে। চার হাত দূরের মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না। কোথা দিয়ে যে কী হল, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সে পথ আর দেখতে পাই না। অন্য পথে চলে এসেছি।

আমাদের দলের একটা লোককে পেলেও বাঁচতাম! দরকারের সময় তাও দুর্লভ! নিরুপায় হয়ে এখানে-সেখানে ঘুরতে লাগলাম। কিছু আশা-ভরসা পেলাম না। এদিকে উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠছিল। ট্রেনের সময় আর বেশি নেই। আসবার কালে আলফ্রেড যেভাবে দাবড়েছেন, যাবার বেলায়ও যদি তাই হয়? অন্তত ঠিক সময় তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হওয়া তো উচিত। তিনি কি জানেন, আমি পথ হারিয়েছি? মিষ্টি করে কেউ জিগ্যেস করেনি, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' আমার জন্য দল নিয়ে তিনি অপেক্ষা করবেন?

পাহাড়ের সানুদেশ বেশ ঠাণ্ডা। জামার মধ্যে তুষার ঢুকে আসছে। অথচ ভয়ে, দুর্ভাবনায় আমি ঘেমে উঠলাম।

সহসা এক অপরিচিত লোককে পেলাম। জিগ্যেস করে বসলাম, স্টেশনের পথ কোন্‌টা ?

সে বুড়ো আঙুল নাড়ল। মানে—ইংরেজী জানে না।

আমিও জার্মান জানি না! চুকে গেল ল্যাঠা!

আবার ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে লাগলাম উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, মাত্র দশ মিনিট বাকী···

তারপর যে কি হবে, ভাবতে গেলেও কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

সব লোক ট্রেনে চেপে চলে যাবে। আমি পড়ে থাকব একা? এইটেই যে শেষ ট্রেন!

ঘড়ি আমার চলছে তো? বারবার বাঁ হাতের কব্জিটাকে কানের কাছে এনে শোনবার চেষ্টা করলাম ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ। না, চলছে তো! ঘড়ি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম।

এখন হারানো পথের কি হবে উপায়?

মরিয়া হয়ে একটা হোটেলের দরজায় এগিয়ে গেলাম।

একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছিল সে-হোটেল থেকে। তাকে জিগ্যেস করলাম, স্টেশনে যাব, কোন্‌ দিকে পথ বলতে পারো?

মেয়েটি ইংরেজী জানত। বললে, ঐ দিক দিয়ে যাও।

একটা পথের নির্দেশ—যা হোক পাওয়া গেল। তার কথামতো সেই পথ ধরলাম। চলে আসতে আসতে আর এক জায়গায় এসে অনেক লোক দেখতে পেলাম। কিন্তু স্টেশন কই? এরা সব কারা? আমাদের দলের লোক কোথায়?

তখনো নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। তখনো ভাবনা। ক্ষণে ক্ষণে তখনো উৎকণ্ঠা।

ফের, আর একটি লোককে জিগ্যেস করলাম লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে: স্টেশন কোথায়?

লোকটি জবাব দিল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেইটেই তো স্টেশন।

তাই নাকি ? উঃ, বাঁচলাম ! হাতে চাঁদ পেলাম যেন !

কিন্তু আমাদের লোকজন কোথায় গেল ? এবার তাদের ভাবনা ভাবো !

পাঁচ হাত দূরের মানুষকে তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না অবিশ্রান্ত তুষারপাতের ফলে। মুহূর্তের মধ্যে যখন আমাদের গোটা দলটা স্টেশনে এসে হাজির হল, যেন দেহে প্রাণ পেলাম। সে কি আনন্দ—আকাশপর্ণী ফুলের মতো ফুটে উঠল নিজের চোখের সামনে। সে কি আশ্বাস—দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দুলে উঠল শিফন শাড়ির হাওয়ার মতো আমাকে ঘিরে।

মনে মনে ভাবলাম, এখন যদি আলফ্রেড আমাকে কিছু বলেনও, শুনতে রাজী আছি। রাগ করব না। অপমান বোধ করব না। আলফ্রেড অবশ্য তেমন কিছুই বললেন না। শুধু একবার বললেন, তোমাকে যে দেখতে পেলাম, এই আমাদের ভাগ্য ! ভয় হচ্ছিল, আবার না সময়ে তুমি আসতে পারো !

ফের ট্রেনে চড়া হল। এবার আর উঁচুতে নয়। নিচুতে নামার পালা। আগের সে আশঙ্কা থেকে এবারও মুক্তি পেলাম না। কি জানি, দড়াম করে নিচে পড়ে ট্রেনটা যদি চূর্ণবিচূর্ণ হয় !

কিন্তু চূর্ণবিচূর্ণ হবার জন্যই কি ট্রেন ? লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছে মরবার জন্য ? এবারও আস্তে আস্তে নিচে নামতে পারলাম। শুনলাম, পিটার নাকি সত্যি সত্যিই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। কিন্তু শুধু পিটারই। আর কেউ উঠতে সাহস করেনি। খানিক দূর পর্যন্ত গিয়ে তারা পিছিয়ে এসেছে।

আবার মোটর লঞ্চে উঠলাম। যাতে এসেছিলাম, তাতেই। সেটা এতক্ষণ বাঁধা ছিল তীরের গায়ে লোহার রেলিঙের সঙ্গে। আমরা উঠতেই দুলে উঠল। স্টার্ট দিল।

কে কখানা ছবি তুলেছে, সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

পিটার বললে, আমি একটা গোটা রোল তুলেছি।

গোটা রোল মানে বারোখানা ছবি।

মিসেস ক্যানাডি আমাকে জিগ্যেস করল, এখন শরীর ভালো হয়ে গিয়েছে তো ?

ধন্যবাদ। উত্তর দিলাম : এখন বেশ ভালো হয়ে গিয়েছে। আসবার সময় গরম লেগেছিল। এখন শীত লাগছে।

তাই নাকি ?—ক্যানাডি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে রইল। বালতির মতো তার একটা প্ল্যাসটিকের ব্যাগ ছিল। ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করল। প্যাকেটটি খুলে আমার সামনে মেলে ধরল। রাংতায় মোড়া অনেকগুলি চকোলেট রয়েছে তাতে। ধন্যবাদ জানিয়ে একটা নিলাম। রাংতাটা জলে ফেলে দিয়ে খেতে লাগলাম।

আলফ্রেড দলের কাছে আমার সম্বন্ধে কথা তুললেন। খুব ফলাও করে জানালেন আমার অটোগ্রাফ দেওয়ার কথা। তাঁর প্রকাশভঙ্গি দেখে মনে হল, তিনি দুঃখিত হননি। খুশি হয়েছেন। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব খুব খারাপ দেখলাম না। বম্বেতে গিয়েছিলেন সৈন্য হয়ে। সেখানে নাকি ভারতীয় রমণীদের মধ্যে অনেক সুশ্রী মেয়ে দেখে এসেছেন। তাঁর কথা শুনে বুঝলাম, আজো তিনি তাদের মুখ ভুলতে পারেননি। মনে রেখেছেন পুরোপুরি। ঘুরেছেন বহু জায়গা : ফ্লোরা ফাউনটেন, জি পি ও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জাভেরি বাজার, এপোলো বন্দর, মহালক্ষ্মী মন্দির, এলিফেণ্টার কেভ, হ্যাংগিং গার্ডেন, মম্বা দেবী রোড, অপেরা হাউস। যে যে স্থান পার হয়েছেন, সর্বত্রই দেখেছেন সুন্দরী তরুণীদের অবাধ কলহাস্য, অগাধ প্রাণ-চাঞ্চল্য। আগে যা শুনেছিলেন, ষোল আনা ঠিক নয়। বিবিরা নয় অন্তঃপুরিকা। তরুণীরা নয় অবগুণ্ঠনবতী।

আমাদের আজকের দলের মধ্যে সকলেই প্রায় ছিল। ছিল না শুধু রবার্টসনের গোষ্ঠি। ছেলে নিয়েই বাপ-মা পাগল। বেশ

শান্তিপ্রিয় আর হিসেবী মানুষ। আজেবাজে কথায় থাকে না। তারা রয়ে গিয়েছে হোটেলে। তাদের অনুপস্থিতি মনটাকে মাঝে মাঝে অভাবগ্রস্ত করে তুলছিল।

আলফ্রেড তাঁর পোর্টফলিও থেকে মাউথ অর্গানটি বার করে বসলেন।

এক একবার পাহাড়ের জঙ্গলের দিকে চান আর উলুধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

এবারও কোনো 'ইণ্ডিয়ান'কে দেখবার সৌভাগ্য হল না।

হতাশ হয়ে আলফ্রেড তাঁর অর্গান বাজাতে শুরু করলেন।

মিচেল আর বেথেল আমার সঙ্গে 'আধুনিক কাব্য' নিয়ে পড়ল। বললে, তুমি তো বাংলা কবিতা লেখ। বাংলা কবিতা শুনতে কেমন লাগে?

আমাদের কাছে তো ভালোই। তোমাদের কাছে কেমন লাগবে, কি করে জানব?

একটা আবৃত্তি করে শোনাও না।

শোনাতে পারি। তোমরা কি বুঝবে?

মানে না বুঝতে পারি, সুরটুকু তো শুনব!

'Twinkle, twinkle little star' পড়েছ?

নিশ্চয়।—বেথেল বাকীটুকু আবৃত্তি করল: How I wonder what you are!

ঠিক সেই রকমের বাংলা কবিতাও আছে।

> "ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কঞ্চনময় দেশ!
> ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ!"

বেশ শুনতে লাগে তো!

নিশ্চয়। বাংলা সাহিত্য ঠিক ইংরেজীর পিছন-পিছন চলেছে। অন্য যে কোনো সাহিত্যকে ছাড়িয়ে যাবার সত্যিকার ক্ষমতা রাখে বাংলা সাহিত্য।

মিচেল তারিফ করল।

আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বললাম, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—যেটা গাওয়া হয়—

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥"

সেটা তো বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা। শুনতে খারাপ লাগে?

না।

আবার অতি আধুনিক ইংরেজী কবিতা শোনো: 'Miranda's song', অডেনের লেখা—

"My Dear One is mine as mirrors are lonely,
As the poor and sad are real to the good king,
And the high green hill sits always by the sea.

Up jumped the Black Man behind the elder tree.
Turned a somersault and ran away waving ;
My Dear One is mine as mirrors are lonely...."

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা—কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

"হিমালয় নাম মাত্র
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা,
—তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।
দিগন্ত-বিস্তৃত স্বপ্ন সমতল উর্বর খেতের আছে বটে,

কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মজে হেজে,
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।

উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যতো পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের
—ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে,
সেই অর্থলাঞ্ছিত যে তাই,
আমাদের সীমা হ'লো
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই।"

প্রাণ খুলে আবৃত্তি করে গেলাম। নিজের আনন্দে। নিজের পরিতৃপ্তিতে। ওরা কতখানি বুঝল, জানি না। তবে মুখে খুব প্রশংসা করল। বললে, বাংলা ভাষা বেশ মিষ্টি।

এতক্ষণ লঞ্চ ভালোই চলছিল।—

হঠাৎ দুলতে লাগল। দুলতে লাগল মোচার খোলার মতো। খানিক আগে আকাশ থেকে সমস্ত রৌদ্র অন্তর্হিত হয়েছে। এখন

মেঘ দেখা দিল। কালো-কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। বাতাসের বেগ প্রবল হল। আরো কালো হয়ে উঠল কালো-কালো পাহাড়। গাছগুলো কোমর দোলাতে শুরু করেছে।

আলফ্রেডের মাউথ-অর্গান আপনা থেকেই থেমে গেল। হ্রদের জল উত্তাল হয়ে উঠল।···

এক বালতি পরিমাণ জল তীব্র বেগে ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে লঞ্চের ভিতর ঢুকে পড়ল। ভিজিয়ে দিল অনেকেরই জ্যাকেট, ট্রাউজার। আমারও জামার খানিকটা ভিজে ঢোল হয়ে গেল।

তখন আরো জোরে দুলছে মোটর লঞ্চ। তাকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না মাঝি। 'দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'—এই অবস্থা।

আলফ্রেড চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখ তাঁর বড় হয়ে গিয়েছে। জল ঢুকে তাঁকেও ভিজিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াতে গেলে টলে পড়তে হয়। এত অস্থির—এত চঞ্চল মোটর লঞ্চ।

আলফ্রেডের এই অবস্থা দেখে সভয়ে ভাবলাম, আজকের জন্যই বোধ হয় জীবনটা ছিল। কাল আর থাকবে না। বিপদ যে এসে গিয়েছে, সন্দেহ নেই। জন্মালাম বাংলায়, বড় হলাম কলকাতায়, আর আজ সেই দেহটা রেখে যেতে হবে সুইটজারল্যাণ্ডের হ্রদগর্ভে! একেই কি বলে, Excursion? প্রমোদভ্রমণ? বহুমূল্য জীবনকে বলি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে এই উন্মাদ নিয়তির আনন্দ? মিস কটন, মিস জোনস্‌, মিসেস ক্যানাডি—সকলেই ভয়ে সিঁটকে গিয়েছে। ঝড় উঠেছে। মোটর লঞ্চ একবার ঝড়ে পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এটা পরীক্ষিত সত্য।

আলফ্রেড মরিয়া হয়ে বললেন, এটাকে পাড়ে নিয়ে গেলে হয় না?

মিচেল বললে, পাড় কোথায়? পাড়ে বাঁধবে কি করে?

কেন, গাছের সঙ্গে?

গাছও তো ঝড়ে ভেঙে পড়তে পারে।

পারে তো সবই। এখন উপায় কি?

আলফ্রেড আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি সাঁতার জানো?

এরকম নৌকা-ভ্রমণ করতে হবে জানলে তো সাঁতার শিখতাম!

এ কথা আর তাঁকে বললাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, জানি না।

ছলাৎ করে খানিকটা জল এসে ফের গায়ে লাগল। ঝাড়তে গেলাম। কোটের আরো খানিকটা অংশ ভিজে গেল।

ঠাণ্ডায়, ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

পিটার বললে, লেক ক্ষেপে উঠেছে।

একে যদি লেক বলা হয়—নদী কাকে বলব, জানি না।

হুহু করে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের ঝড় কখনো দেখিনি। এমন সাংঘাতিক তার রূপ—কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। আর ঝড়ের সঙ্গে কী বিকট এক গোঙানির আওয়াজ। যেন আওয়াজ নয়—মহাকালের শঙ্খধ্বনি!

বেথেল মাঝিকে জিগ্যেস করল, আর কতদূর আছে?

মাঝি কথা বললে না। বোধ হয় ইংরেজী সে জানে না। বুঝতে পারেনি।

অদূরে মোটর লঞ্চের ঘাঁটি দেখা গেল।

আমরা যেন প্রাণ পেলাম। আঃ, কি আরাম!

আমাদের হোটেল থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। তা হোক, ডাঙায় উঠতে পারব।

মাঝি কোনোরকমে নামিয়ে দিতে পেরে হাঁপ ছাড়ল।

তার সঙ্গে করমর্দন করবারও আর সময় পেলাম না। আমরা ঘোড়ার মতো দৌড়তে শুরু করলাম। একে হ্রদের জলে ভিজে গিয়েছি, ঝোড়ো হাওয়া···তার ওপর বৃষ্টি। আর শুধু বৃষ্টি হলেও

সহনীয় ছিল—একেবারে শিলাবৃষ্টি। সে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড! মাথা আর চোখ বোধ হয় রক্ষা করা যায় না।

হ্রদের পাশ দিয়েই রাস্তা। ঠকঠক করে কাঁপছি আর দৌড়চ্ছি।

এখানে রাত্রি নটায় সন্ধ্যা হয়। কিন্তু সাড়ে সাতটাতেই যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পৃথিবী। দিগন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন। শিল পড়া বন্ধ হল। কিন্তু বৃষ্টির শর দুর্নিবার। সুতীক্ষ্ণ। তা থেকে আর পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। সকলেই আমার মতো দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে আমাদের দলের যত যুবক-যুবতী। বেথেল, মিচেল, পিটার—সকলেরই প্যাণ্ট-কোট ভিজে জাব। মিস কটন, মিস জোনস, মিসেস জেবসন—তাদেরও স্কার্ট থেকে জল ঝরছে। সুপুষ্ট বক্ষস্থল ভিজে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর পাহাড়ে বন, বনস্থলী, বনস্পতিতে জেগেছে সে কি সুতীব্র উন্মাদনা!

মিসেস ক্যানাডি বৃদ্ধার দলে। তারও যে দৌড় দেখতে হবে আমাকে, কোনোদিন ভাবিনি। যেন হাসতেও ভুলে গিয়েছি।

যেমন দুপুরবেলা গরম পেয়েছিলাম, ফেরবার পথে তেমনি ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দিল ব্রুনেন হ্রদ। আর হ্রদের তখন মূর্তি দেখে কে? যে ছিল কেঁচো, সে হয়েছে কেউটে। হুড়মুড় করে উত্তুঙ্গ ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে তটভূমিতে।

কাকে ভরসা আছে? গাছের তলায় যে দাঁড়াব, গাছ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে? দৌড় ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু দৌড়তে গিয়েও যেন হোঁচট খেতে হল। আমি আর পিটার পিছিয়ে পড়েছিলাম। পাশে গাছ। গাছে অজস্র শাদা ফুল, কি ফুল জানি না। বৃষ্টি আর বাতাসে সেগুলি লুটোপুটি খাচ্ছে। সহসা দেখলাম, গাছের আড়ালে···

ও কে?

একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণী। বৃষ্টিতে ভিজে রূপ যেন তার

দ্বিগুণ খুলেছে। আর তার হাতের উপর চ্যাংদোলা হয়ে ঝুলছে একটি বিকলাঙ্গ যুবক। তরুণীও ছুটছে।

পিটারই পরিষ্কার করে দিল ব্যাপারটা: গতকাল হোটেলে তরুণীটির সঙ্গে তার আলাপ হয়। মেয়েটি ইতালিয়ান। এখানে এসেছে বেড়াতে। যাকে নিয়ে ছুটছে—সেই যুবকটিই তার স্বামী। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সদাপ্রফুল্ল মেয়েটির পরিশ্রমের অন্ত নেই। ঘরে বাইরে—দিবারাত্র তার প্রলম্বিত কর্মসূচী। স্বামী আগে বিকলাঙ্গ ছিল না। ছিল তার নিটোল স্বাস্থ্য, সতেজ যৌবন, সাবলীল জীবনধারা। গত যুদ্ধে দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়েই যুবকটির এই হাল!

সুইটজারল্যাণ্ডের বুকের উপর একটি স্বর্গীয়—অপূর্ব মাতৃরূপ দর্শন করলাম!

হোটেলের উত্তাপে এসে যেন জীবন পেলাম।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকে জামা-টামা বদলে ফেললাম।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। সারাদিনে কী করেছি, কী ঘটেছে—সেইসব ভাবতে লাগলাম। ঘরের চারিধারে তাকাতে লাগলাম। তাকাতে তাকাতে চমৎকৃত হয়ে গেলাম।

দুপুরবেলা দেখে গিয়েছি, আমার বিছানা ছিল বিশৃঙ্খল, আমার বেসিন ছিল অপরিষ্কার, আমার ঘরে পরবার পামশুজোড়াটা ছিল এলোমেলো। এখন কী দেখছি?

সুন্দর বিন্যস্ত বিছানা। তার উপর সিল্কের ঢাকা। আরশির মতো ঝকমক করছে বেসিন। আর, আরও আশ্চর্য, পামশুজোড়াটা সযত্নে কে তুলে রেখেছে দেরাজের মাথার উপর। কার একটি সুন্দর অদৃশ্য হাত যে আমার অলক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছে, বুঝতে দেরি হল না। সেই মেয়েটি······

সেই মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় চিত্ত বিগলিত হল, যে আজ সকালেও আমাকে সাহায্য করেছিল······

হোটেল থেকে সে মাইনে পায়। বুঝলাম, এসব তাকে করতেই হবে। তাই বলে জুতোজোড়াটাও তাকে তুলে রাখতে হবে যত্ন করে দেরাজের মাথার উপর—এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে? যদি সে না তুলত—যদি পড়ে থাকত ঠিক আগের মতোই—মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হয়ে যেত? তার জন্য আমার কোনো অভিযোগ কি বৈধ হত? না, অভিযোগ করবার সুযোগ পেতাম?

ঘড়িতে দেখলাম আটটা বাজে। আর তিন মিনিট মাত্র বাকী।

নিচে যেতে হল ডিনার খাবার জন্য।

খাওয়া-দাওয়ার পর আজো সেই বার-এ আড্ডা।

এক বোতল বিয়ার কিনে পান করতে হল সকলের সঙ্গে বসে।

কয়েকটা সিগারেটেরও আদানপ্রদান হল।

দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে এলাম সকলকে গুড্ নাইট জানিয়ে।

বিয়ার পানের ফলে শরীরে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। বুকটা টিপটিপ করছিল।

এদিকে বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝিলিক। এক একবার বজ্রপাতের শব্দ। রুদ্ধ জানালাটা ঢেকে দিলাম একটা মোটা পর্দা ছড়িয়ে। আরাম করে বিছানায় বসলাম।

বসতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। ঠিক পায়ের কাছেই আমার পামশু। যখন খেতে গিয়েছি, মেয়েটি কোন্ ফাঁকে হয়তো ঘরে এসে ঢুকেছিল। যেখানকার যা—সব ঠিক আছে। পড়ে আছে আগের মতোই নির্দিষ্ট জায়গাতে আমার ঘড়ি, আমার ক্যামেরা, আমার সিগারেটের টিন। কোথাও কিছুর রদবদল হয়নি। হয়েছে শুধু পামশুটার। আমি খেয়ে এসে বসব। বুট খুলে এই পামশুটায় পা গলাব। হিসাব একেবারে নিখুঁত। অনুমান একেবারে পাক্কা।

ওর যত্নের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক সাধুবাদ না জানিয়ে পারলাম না। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জ্ঞাপন—সে শুনল কই? শুষ্ক সাধুবাদে কার কী যায় আসে? তার অজান্তে তাকে দুটো গাল দিলাম, কী ভালো কথা উচ্চারণ করলাম—তাতে তার কী বয়ে গেল? কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যও একটা সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গির প্রয়োজন। মনের একটা পরিচ্ছন্ন পরিচয় অপেক্ষমাণ। তার বাহন কি? বাহন হচ্ছে পয়সা?

সাধারণ লোকে অবশ্য এইটেই বোঝে। জগতে সাধারণ কে নয়? পেটের জন্য যাকে খাটতে হয়, তাকে কি অসাধারণ বলব? পয়সা দিলে সে কি বলবে—নেব না?

অথচ এইটে নিয়েই গোলযোগ! দেওয়ার কি শেষ আছে?

দেবার যার ক্ষমতা আছে, সে শুধু প্রিয়জনকে সোনার কঙ্কণ, মুক্তোর সিঁথিময়ূর, প্রবালের মালা, হীরের কণ্ঠহার, প্ল্যাটিনামের দুল, আইভরির হাঁসুলি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না ; দেয় সম্পূর্ণ করে আরো কত কিছু। উৎসর্গ করে তাজমহল! একটি তিলের বিনিময়ে দেয় বোখরা-সমরকন্দ। কিন্তু যার ইচ্ছে আছে অথচ ক্ষমতা নেই—তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে ?

আমার কাছে পয়সা এত বেশি ছিল না—যা দিয়ে মেয়েটিকে খুশি করতে পারি। তবে আন্তরিকতা ছিল। অভিমুখিতা ছিল। শ্রদ্ধা ছিল।

মেয়েটি যখন এতখানি করতে পারল, আমার মনের গহনদেশ দেখতে পাবে না? দেখতে পাবে না আমার আন্তরিকতা, আমার অভিমুখিতা, আমার শ্রদ্ধা ?

এত ছোট করে কেন তাকে ভাবব ? তাকে ছোট করতে গেলে নিজে যে ছোট হয়ে যাব! সকালবেলা লিফ্টের ব্যাপারে তার সাহায্য নিয়েছিলাম, অথচ ভুলেও একবার তাকে ধন্যবাদ দিইনি! এ বেলা সে আমার এত করল, অথচ এখনো আমি নীরব! অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে ?

এই আকাশভাঙা বৃষ্টি—এই ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝিলিক—সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলের এই নির্জন ঘর—শরীরে আমার বিয়ারের বিষক্রিয়া, এখনো যদি না তাকে ডেকে পাঠাই, যদি না তাকে কাছে পেয়ে বলতে পারি—তোমায় আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কী হল তবে বেঁচে ফিরে এসে ? তলিয়ে গেলাম না কেন তবে হ্রদের অতলে ?

শুধু একটি বোতাম টেপার অপেক্ষা।—খাটের পাশে দেওয়ালের গায়ে যে বোতামটি আছে লাগানো।

রক্তের উষ্ণতাকে সাক্ষী রেখে বোতামটি টিপে বসলাম।

আর বোতাম তো নয়—যেন একটা পাগলা ঘন্টি।

সমস্ত হলটা কাঁপিয়ে যেন একটা তীব্র চাবুকের আওয়াজ চলে

গেল দিগবিদিকে। আর সেটা এত তীব্র যে, এই রুদ্ধঘরে থেকেও তা অনুভব করতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করলাম না।

ঠিক এক মিনিট।

এক মিনিট পরে শুনলাম, কে যেন করাঘাত করছে আমার দরজায়—বাইরে থেকে।

সাগ্রহে, সানন্দে দরজা খুলে দাঁড়ালাম।—

কিন্তু এ কে? একে তো আমি দেখিনি। একে ধন্যবাদ দেবার জন্য—শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তো আমি ডাকিনি।

কে তুমি?

মেয়েটি কী বললে—কিছুই বুঝলাম না। ভাষাটা ইংরেজী নয় —খাঁটি জার্মান। যেন নিঃশেষে নিবে গেলাম ভিজে দেশলাইকাঠির মতো।

মেয়েটিকে দেখতে টেরা, শরীরে কিছুই নেই—হাড় কখানা মাত্র সার। কিন্তু অনুনয়ের হাসি আছে তার মুখে।

কী তাকে বলব? কী তাকে বলতে পারি?

খানিকটা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। চেয়ে থেকে থেকে বললাম, গুটি নাকট্ (গুড্ নাইট)।

মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখের উপর দরজাটাকে দিলাম বন্ধ করে।

* * *

যার প্রতি রাত্রে নির্দয় হয়েছিলাম, সকালবলা তাকেই নমস্কার জানালাম। নমস্কার জানালাম তাকেও, যার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর বিগলিত হয়েছিল।

কে আমার জুতোজোড়াটির প্রতি এতখানি মনোযোগ দিয়েছিল জানি না। যে-ই দিক, সকলকে নমস্কার জানিয়ে হোটেল থেকে বিদায় নিলাম। জীবন থেকে খসে গেল জীবনের মতো দুটো জীবনাধিক রাত্রি। কত মধুর, কত মর্মান্তিক রাত!

আবার যাত্রা শুরু হল।

সেই হ্রদের পাশ দিয়েই এগিয়ে চলল বাস। পাশে পাহাড়।

হ্রদের জলে অগুনতি ছিপ পড়েছে। তৃণাচ্ছাদিত তটভূমিতে তাঁবু। সুন্দর সুন্দর বাগান। আর বাগানে কী বড়-বড় এক-একটা গোলাপ ফুল! বাটির মতো পুরু। সিঁদুরের মতো রাঙা।

একটি চ্যাপেলের সামনে এসে বাস দাঁড়িয়ে গেল।

আমরা সকলেই নামলাম। রাস্তাটা সরু। চ্যাপেলের গায়ে লেখা : Astrit 1935. মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট মূর্তি। বেলজিয়মের রানী নাকি একসময় রাজার সঙ্গে এ পথে বেড়াতে এসেছিলেন। বেড়িয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন, আর-একখানা গাড়ি এসে রানীকে দিল চাপা। সেই শোকাবহ স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে বাজেল রাজ্যের প্রজারা। রানী খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এখনো মন্দিরে মূর্তির পায়ে প্রত্যহ ফুল দেওয়া হয়।

গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড় করানো গেল না। একটা গাড়ি থাকলে এ পথে আর একখানা গাড়ি চলতে পারে না।

উঠতে লাগলাম উঁচুতে। উঠতে উঠতে পাহাড় অতিক্রম করা হল। ওল্‌টেন থেকে পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট।

নিচে রাইন উপত্যকা। রাইন বয়ে যাচ্ছে তরতর করে। তার উপর দিয়ে ইস্পাতের পাকা সেতু।

সুইজ-বর্ডারে এসে পাসপোর্ট বার করতে হল।

এই সেই ম্যাজিনো লাইন। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। বাস দ্রুতগতিতে, লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোথাও পথ উঠে গিয়েছে তিনতলার সমান উঁচুতে। কোথাও নেমে গিয়েছে তিনতলা থেকে নিচুতে। চড়াই-উৎরাইয়ের রোমাঞ্চকর উত্তেজনা!

ম্যাজিনো লাইনের কথা কে না জানে? যুদ্ধের সময় একটি কিশোর পর্যন্ত কাগজে এর নাম দেখেছে। আমিও তখন দেখেছিলাম। কিন্তু কে জানত, সেদিন যে-নামটি দৈনিক পত্রিকাতে ফুটে উঠত, আজ সত্য সত্যই ফুটে উঠবে তার অস্তিত্ব এমন করে দৃষ্টিপথে! বারুদের স্মৃতিতে উষ্ণ ফ্রান্সের এই উদ্ধত উদ্‌ঘাটন!

ধুধু করছে মাঠ। কাঁটাতারের বেষ্টনী। মাঠের মাটি লালচে। কোথাও পুরু জমাট ঘাস। মাঝে মাঝে খণ্ড-বিখণ্ড বিস্তৃত টিলা। সেই টিলার ভিতর থেকে উঁকি মারছে দুর্ধর্ষ কামানের মুখ। এরকম একটা নয়। হাজার হাজার কামানের মুখ উঁকি মারছে মাটির তলা থেকে। মাটির নিচে কতখানি গভীরতা—কে জানে! কিন্তু যে-কামান একদিন অবিশ্রান্ত গর্জন তুলেছিল ইওরোপের মাটি কাঁপিয়ে, আজ তারা নির্বাক। কিন্তু যেন অন্ধ নয়। এখনও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকা ইত্যাদি; আর একদিকে প্রচণ্ডবিক্রম হিটলার! হিটলার যে মৃত—এখনও এদেশের অনেক লোক বিশ্বাস করে না।

বাসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। অনেক পথ ছাড়িয়ে আসা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক পথ ছাড়িয়ে যেতে হবে।

পথের দুপাশে অবারিত শস্যক্ষেত্র। সবুজের প্রদর্শনী। বার্লি, বীট, শন, ভুট্টা—কিছুরই অভাব নেই। টেলিগ্রাফের তার চলে গিয়েছে দিগন্ত ছাড়িয়ে। বহু বাড়ি নজরে পড়ল। যেমন বাড়ি—

তার চেয়ে বিশাল গির্জা, গির্জার চূড়া! লৌহখনিতে অবিশ্রান্ত কাজ চলেছে।

ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে খড়ের গাড়ি।

পথের পাশে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি। এমন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সহসা দেখলে চমকে উঠতে হয়! যেন সত্যিকার মানুষ—অবিশ্বাসী জনতার হাতে সত্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

চলেছি এবার ফ্রান্সের নান্সির দিকে।

ছুপাশে ছায়াভরা কুঞ্জবন। পাহাড়, ঝরনা, ফলের বাগান, কাঠগোলা, আঙুর খেত, তৃণভূমি, হোটেল—কী নেই?

শহর পড়ল সেণ্ট ডি। নান্সির নিকটবর্তী হতে লাগলাম। গোরস্থান, লোহার বিরাট পুল, হ্রদ, কয়লার খনি—একে একে পার হতে হল।

অবশেষে ঢুকলাম নান্সির শহরতলিতে।

আজব নগর নান্সি! সাবেকী ধরনের সব বাড়িঘরদোর। সাধারণ গলির বাড়িগুলি কেমন যেন গরিব-গরিব। একতলা থেকে তিনতলার ভিতর। এ ইওরোপ নয়। বাংলাদেশের চন্দননগর যেন! আশেপাশে অপর্যাপ্ত মদের দোকান। যেসব বাড়ি নজরে পড়ল, অধিকাংশেরই দেওয়ালের আস্তর উঠে গিয়েছে। জানালার খড়খড়ি ভাঙা। রাস্তার কলের জলের মুখ উড়ে গিয়েছে। রবারের নল ঝোলাতে হয়েছে।

অনেক পার্ক। পার্কগুলি কিন্তু সুন্দর। কতকগুলি পার্কে পায়রা অথবা ঘুঘু চরছে। পার্কের বেঞ্চে এলোমেলো অনেক লোক শুয়ে বসে পাইপ টানছে। পোশাক কারও উচ্চাঙ্গের নয়। অনেকে টাইও পরেনি। তাদের দেখলে গরিব, বেকার অথবা পাগল বলে সন্দেহ হয়।

প্রচুর কাফে। ইংল্যাণ্ডের কাফেতে কলরব নেই। এখানকার কাফে সরগরম। নান্সির রেল-স্টেশনটি ছোট। বিদ্যুৎচালিত ট্রেন থেকে সিটি বাজছে।

একহারা ট্রাম চলেছে শহরের বড় রাস্তা দিয়ে। তাতে মেয়ে কনডাক্টর। মেয়ে কনডাক্টর হেসে পয়সা নিচ্ছে। হেসে টিকিট দিচ্ছে। ট্রামের ভিড় নিঃসন্দেহে পরিমিত।

বিরাট একটি চত্বর। চত্বরে সুন্দর সব স্ট্যাচু। চারিধারে প্রাসাদ-মালা। তাদের অপরূপ ভাস্কর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাসাদমালার একদিকের গেটগুলিতে সোনালী কাজ করা। ভিতরে নাম-না-জানা কত রকমের বৃক্ষবীথিকা! চমৎকার ফোয়ারা। ফোয়ারা দিয়ে অবিশ্রান্ত জল উৎসারিত হচ্ছে। সে অপরূপ সৌন্দর্য ভোলবার নয়।

সন্ধ্যায় একটি হোটেলে এসে উঠতে হল।

হোটেলটি শহরের বুকের উপর। একান্ত অভিজাত পাড়ায়। ছতলা বাড়ি। হোটেলের কর্তৃপক্ষ ফরাসী ভাষায় কথা বললেন। ইংরেজী তিনি বোঝেন, কিন্তু সাধ্যমতো বলেন না। এ-অধমের ঘর পড়েছিল চারতলায়। এ ঘরটি তত সুন্দর নয়, যত সুন্দর ঘরে এ পর্যন্ত কাটিয়ে এসেছি। একটা ছোট একহারা ঘর। জানালা বন্ধ করলে দম আটকে মরে যাবার ভয়। তেমন হাওয়া-বাতাস তো নেই-ই ; তার উপর আলো না জেলে রাখলে ঘর অন্ধকার। এক রাত্রির তো মামলা। দিব্যি দুটো আলো জ্বাললাম। জানালাটা খুলে একটু ফাঁক করে রেখে দিলাম।

চারতলা থেকে লিফটের সাহায্যে এলাম দোতলায়। ডিনার খেতে।

একেবারে রাস্তার দিকে ডাইনিং-হল। সে-হল থেকে বাইরের দিকে তাকালে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আলোর নৃত্যলীলা চলেছে এক একটি বিরাট বাড়ির বোর্ডের উপর। নানা রকমের আলো—কখনও জ্বলছে, কখনও নিবছে। স্খলিত আলোর বিজ্ঞাপন। পথের উপর ট্রাম চলেছে ঢং ঢং শব্দ করে। অদূরে পত্রিকার স্টল। সেখানে এক একটি লোক যাচ্ছে আর সান্ধ্য-পত্রিকা কিনে পড়তে-পড়তে চলে আসছে। নিগ্রো ভদ্রলোকরা এখানেও ছড়িয়ে পড়েছেন।

আশেপাশে বহু হোটেল। সেসব হোটেলের গা থেকে উচ্চকিত আলোর বন্যা—দেখবার মতো। রাস্তার দুপাশে মোটরের ভিড়।

যে-টেবিলে খেতে বসেছিলাম সেখানে মাত্র তিনজন মহিলা আর আমি। অন্যান্য টেবিলে আমাদের দলের অন্যান্য নরনারী। আমার পাশে ছিল মিসেস ক্যানাডি। সামনে মিস কটন, মিস জোন্স্।

পানীয় জলের অভাবে খাদ্য গলাধঃকরণ করতে কষ্ট হচ্ছিল। সেটুকু বোধ হয় লক্ষ্য করেছিল মিস কটন। তাই বললে, আমার পেগটা নিতে পার।

পিপাসার আধিক্যে পেগ টানব কি—গন্ধ শুঁকেই অস্থির।

ইচ্ছে করল গেলাসটা মাটিতে ভেঙে ফেলি!

গেলাসটা অবশ্য ভাঙা গেল না। পরের জিনিস।

কিন্তু আর একটি জিনিস ভাঙলেন আমাদের দলপতি মিঃ আলফ্রেড অতি অসতর্ক মুহূর্তে, অতি সহজে। সেটা হল ভোজনসভার শান্তি।

খাচ্ছিলেন। খেতে-খেতে তড়াক করে উঠে এলেন। চ্যালেঞ্জ করলেন মিসেস জেবসনকে।—তোমাকে কোর্টে নিয়ে যাব! কাল সকালেই এর বিহিত করব। আমাকে ফাঁকি দিয়ে—আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তুমি পার পাবে? কী করে তোমার মতো মেয়েমানুষকে জব্দ করতে হয়, আলফ্রেড জানে!

সবাই তো থ।

মিসেস জেবসন ছুরি-কাঁটা ফেলে ভয়ে কাঁটার মতো হয়ে বসে রইল।

আলফ্রেড গর্জাতে লাগলেন। আমাকে না জানিয়ে—ফোন? ট্রাঙ্ক কলের পয়সা আমি দেব?

বুঝলাম ব্যাপারটা। মিসেস জেবসন আলফ্রেডকে না জানিয়ে কোন্ ফাঁকে নাকি হোটেল থেকে ফোন করেছিল লণ্ডনে। এখন

হোটেলওয়ালা আলফ্রেডকে চেপে ধরেছেন। তাই তাঁর এত উষ্মা।

এক চোট বলে আলফ্রেড নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

ফের এক মিনিট পরেই আবার তেড়ে এলেন।—কথা বলছ না যে?

জেবসন একটি কথাও বললে না। চুপ করে বসে রইল। দূর থেকে দেখলাম, তার চোখে জল!

আলফ্রেডের আচরণ যে নিন্দনীয়—মানুষমাত্রেই সেটা অনুভব করবে। আমিও ব্যথিত হলাম কম নয়। একটা মানুষ যখন খেতে বসেছে, তাকে শান্তিতে খেতে দেওয়া উচিত ছিল। একটা ট্রাঙ্ককল যদি করেই থাকে—এই প্রকাশ্য অপমান তার প্রাপ্য হতে পারে না।

আমার মতো দলের অন্যান্য সকলেই ব্যথিত হয়েছিল। বিশেষ করে মিস কটন, মিস জোন্‌স্।

মিস কটন একবার ইঙ্গিতে আলফ্রেডকে ডাকল। আলফ্রেড দেখেও দেখলেন না। তখনও টেবিলে মিস কটনের পরিপূর্ণ ডিশ পড়ে আছে। সেই মাত্র পরিবেশক এসে পাতে মাংস দিয়ে গিয়েছে।

মিস কটন বললে, এক্সকিউজ মি···

দুজনেই উঠে চলে গেল। মিস কটন, মিস জোন্‌স্।

যাবার সময় একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে গেল মিস কটন আলফ্রেডের প্রতি। তীব্র কটাক্ষের মানে হচ্ছে প্রতিবাদ। তোমার অন্যায় দেখেছি, তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য ডেকেছি। তুমি কথা শোননি। গ্রাহ্য করনি আমাদের। এ হচ্ছে তারই জবাব। টেবিলে খাবার ফেলে উঠে গেলাম—এ হচ্ছে তারই প্রত্যুত্তর।

অতগুলো লোকের মধ্যে মিস কটনকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করল। অতগুলো লোকের ইজ্জত—একা সে-ই রেখেছে। মিস জোন্‌স্‌কে নিয়ে উঠে গিয়ে সে একটা অপরূপ নেতৃত্ব দিয়ে গেল।

আলফ্রেডও খানিকক্ষণের মতো চুপ করে রইলেন।

পরদিন সকালে দেখা হতেই মিস কটনকে বললাম, তোমার গত সন্ধ্যার রূপ সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমার কথা শুনে মিস কটন যে খুব খুশি হল, মনে হল না।

বললে, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছিলে নাকি?

খানিকটা পেরেছিলাম বৈ কি!

লাক্সেমবার্গ যাত্রার জন্য হোটেলের সামনে বাস অপেক্ষা করছিল। উঠতে যাচ্ছি—আলফ্রেড দেখা করলেন। বললেন, কেমন দেখলে কালকের ব্যাপারটা?

বললাম, অত উগ্র না হলেও পারতে! বিশেষ করে খাবার টেবিলে।

তুমি জান না।—আলফ্রেড বললেন, ওরা কী ধূর্ত! যদি খাবার টেবিলে না বলি তো কখন বলব?

ব্যাপারটা কী দাঁড়িয়েছে এখন?

টাকা দিয়ে দিয়েছে মিস কটন। তাও, সহজে কি দিয়েছে? তুমি ছিলে বলেই তাই!

কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

বেলা তখন বারোটা।

সূর্য-আলোয় ঝলমল করছে দিন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পৃথিবী।

পৌঁছলাম এসে লাক্সেমবার্গে। প্রাচীন এবং নবীনের সমন্বয়ে ডাচদের হাতে গড়া একটি সুন্দর শহর। লাক্সেমবার্গ।

একটা হোটেলে উঠে লাঞ্চ খেলাম। ঝোল, আলুসিদ্ধ, কাঁচা কপি পাতা, রুটি আর এক বাটি গরম মাংস। মাংসের রঙ দেশের মতো। সোনালী এবং সুস্বাদু। ঝাল, গরম মসলা—কিছুরই অভাব নেই তাতে। খুব খেতে লাগলাম। খেতে খেতে সহসা মনে হল—এ তো পাঁঠার নয়! তবে কিসের?···আর খেলাম না। অনেকখানি মাংস পাতে ফেলে রেখে হাত গুটিয়ে বসলাম।

তখনো খাওয়া সকলের শেষ হয়নি। লেগে গেল ঝগড়া।···

মিস জোন্‌স্ নাকি মিসেস রবার্টসনকে বলেছিল, তোমার ছেলের জন্যে টেকা যায় না।

তাই নিয়েই বাধল।

ছেলের মর্ম তুমি কি বুঝবে? মিসেস রবার্টসনও আক্রমণ করল।

মিস জোন্‌স্ খাবার ফেলে উঠে চলে গেল।

পিছু পিছু ছুটল মিসেস রবার্টসন। তাকে না ধরতে পেরে আলফ্রেডকে ধরল: আমরা পয়সা দিয়ে দেশ বেড়াচ্ছি বলে কি আমাদের আত্মমর্যাদাও বিকিয়েছি?

কি হয়েছে? আলফ্রেড জিগ্যেস করলেন।

আমার ছেলের জন্যে মিস জোন্‌স্ আমাকে অপমান করেছে।

মিস জোন্‌স্ তোমাকে অপমান করেছে, না, তুমি করেছ তাকে—ঠিক করে বলো দেখি?

তোমার কাছে বিচার চাইতে এসে এই কি প্রতিফল?

আমি সব দেখেছি।—

আলফ্রেডও কমতি যান না।

তুমি দেখেছ ? বাজে কথা বোলো না।—

মিসেস রবার্টসন কেঁদে ফেলতে ফেলতে সামলে নিল।

আমার সামনে আর কিছু হল না।

এরা সকলেই ভয় করে বিদেশী সাহিত্যিককে। বিদেশী সাংবাদিককে। আমার সঙ্গে 'ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের' চিঠি ছিল। এরা সকলেই জানত তা। খাওয়ার পর হোটেল থেকে বেরিয়ে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়ল। আমিও ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় গিয়ে দেখি, মিসেস রবার্টসন আর মিস জোন্‌স্‌—দুজনে মিলে বোঝাপড়ায় মত্ত হয়েছে। আর, আমাদের দলের অন্যান্য লোকজন তাদের মধ্যে মিল করাবার চেষ্টা করছে। মিঃ রবার্টসনও আছে।

আলফ্রেড এদিক-সেদিক ঘুরছিলেন তাঁর ভুঁড়িটা নিয়ে। তাঁকে ধরে আনা হল।

অনেক বুঝিয়ে আলফ্রেড দুজনের হাত এক করে দিলেন। আপসে একটা মীমাংসা হল। আলফ্রেডের কৃতিত্ব আছে বৈকি !

একটা ব্যাঙ্কে যাওয়া হল। যার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল, বদলে লাক্সেমবার্গের চালু টাকা নেওয়া হল।

তখনো আমরা আমাদের নির্ধারিত বাসে উঠতে পারলাম না। বাস অপেক্ষা করছিল।

আলফ্রেড বললেন, বুকের কোনখানটায় হৃৎপিণ্ডটা থাকে ?

মিচেল একটা জায়গা দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না আলফ্রেড। বললেন, ঠিক ঐ জায়গাটাতেই কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করছি।

ষাঁড়ের ডালনা খাবার পর আমার অনুভূতিটাও অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমার মতো রসবোধের ক্ষমতা অনেকেরই ছিল কিনা, জানি না। কিন্তু কেউই আলফ্রেডকে সহানুভূতি জানাতে এল না। কেউই মাথা ঘামাল না ও-নিয়ে। কারণ ঐ চেহারার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ব্যথাটা মনগড়া কিনা, সেইটেই একটা বিবেচনার বিষয়। পরে তার চিকিৎসা, তার ব্যবস্থা! কিন্তু যার জ্বালা, সে বিচলিত না হলে চলে না। সেই জন্যই নিজের বন্ধু একমাত্র নিজে। আলফ্রেড বললেন, তোমরা ঘুরে-ফিরে বেড়াও। আমি ডাক্তার দেখিয়ে আসি।

ডাক্তার দেখাতে গেলেন, কি বার-এ গিয়ে ঢুকলেন—তিনিই জানেন। আমরা আর তারপর খোঁজ নিইনি তাঁর অসুখের।

বেড়াতে লাগলাম লাক্সেমবার্গের বুকের উপর।

কোনোদিন যদি কোনো শুভানুধ্যায়ী এসে আমার অস্তিত্ব খোঁজে এই লাক্সেমবার্গ শহরের মধ্যে, লাক্সেমবার্গের নীরব মাটি ভুলেও এর জবাব দিতে যাবে না। কিন্তু আমি তো জানি, এই শহরের বুকের উপর জুতোর ধূলিচিহ্ন রেখে গিয়েছি। দেখেছি লাক্সেমবার্গ স্টেশন। রেল-স্টেশনের গম্বুজওয়ালা সুন্দর বাড়ি। ট্যাক্সি দাঁড়াবার প্রচুর জায়গা স্টেশনের পাশে। প্রচুর ট্যাক্সি। ব্যাগেজ-রুমের সামনে লেখা: Bagages, সিগারেটের দোকানের মাথায় লেখা: Tobacs Journaux, নেমপ্লেটে রাস্তার নাম: De La Gare.

তারপর অজস্র দোকান। অজস্র হোটেল। দুপুরে সেখানে লাঞ্চ খেতে এসেছে লোকজন। অজস্র বিরাট সৌধশ্রেণী। অজস্র দোকানে অসংখ্য ছবিওয়ালা কার্ড।

এখানে কিছু লোক জার্মান ভাষায় কথা বলে। কিছু ফ্রেঞ্চ। কিছু আবার ডাচ। দুই মহাযুদ্ধেই জার্মানির আক্রমণ একে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। এর আয়তন শুনলাম ১০০০ বর্গ মাইল।

আলফ্রেড ঢুকে পড়তেই বাস গর্জন করে উঠল।

আমরা আগেই ঢুকে বসেছিলাম। একে পথ হেঁটে ক্লান্ত, তারপর ভাজা-ভাজা হয়েছি রোদে।

বাস ছাড়তে যেন আরামের নিশ্বাস ফেললাম।

আবার মাঠ-ময়দান আরম্ভ হল। ভালো ভালো বাগিচা। ফুল ফুটে আছে মনোরম। বাড়ি, দোকান, পথ, পান্থশালা……

কয়লাখনিতে কাজ হচ্ছে। বড় বড় ক্রেনের ঘড়ঘড় আওয়াজে আকাশ মুখর। শ্রমিকরা ঘর্মাক্ত, কিন্তু নিরুদ্যম নয়। 'ওরা কাজ করে'। লৌহখনিতেও ঐ কর্মোদ্দীপনা…ঐ প্রাণবন্যার অবারিত উদ্ধৃতি।

বেলা চারটে নাগাদ একটা হোটেলে এসে প্রবেশ করলাম।

কন্‌স হোটেল, লাক্সেমবার্গ। দুটি মেয়ে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ। দলের ভিতর কেউ চাইল বিয়ার, কেউ কফি।

খুব তৃষ্ণার্ত ছিলাম বলে আমাকেও কফি নিতে হল। মেয়ে দুটি এত যত্ন করে সকলকে যুগিয়ে যেতে লাগল যে দেখলে তারিফ করতে হয়!

হোটেলের সৌন্দর্য বলতে শুধু ঐ মেয়ে দুটিই ছিল না। আরও চারটি প্রাণী ছিল। একটি বুলডগ, একটি বিড়াল আর তার দুটি ছানা। কুকুর-বিড়ালের মধ্যে কোনো ঝগড়া প্রত্যক্ষ করলাম না। প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী। তারা জানে, একজনের জুটলে অপরেরও জুটবে। জাতে তারা আলাদা, মতবাদে তারা ভিন্নপন্থী কিন্তু এটুকু বিশ্বাস তাদের উভয়েরই আছে, শাসক তাদের এক। মালিক তাদের অভিন্ন।

দুটি বিড়ালবাচ্চাকে বারবার ধরবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারলাম না। বারবার সামনে আসে আর মায়ের কাছে পালিয়ে যায়। বেশ দেখতে দুটি বাচ্চাকে। তেড়ে গিয়ে ধরতে পারতাম। পাছে তাদের মা আমাকে তেড়ে এসে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়, সেই ভয়ে আর এগোলাম না।

একটি মেয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি যেন বললে। বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। দেখি, বুলডগটি ততক্ষণে আমার কোলের কাছে

এগিয়ে এসেছে। তার চোখের নীরব ভাষায় আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তার মাথাটায় অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলোতে লাগলাম। আরামে সে মাঝে মাঝে চোখ বুজতে লাগল। গা-টা কি শক্ত তার! কোথাও কোমলতার লেশমাত্র নেই তার দেহের চামড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে আদর করে যখন উঠে চলে আসছি, দেখি, বুলডগটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে চায়। আমাকে এগিয়ে দেবে সে। তাকে আদর করেছি, এই জন্যই কি তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন? বাইরে যখন চলে এলাম, দুটি মেয়েও আমাদের পিছন পিছন এল।

বাস এগোতে লাগল।

আর্লং (Arlong) ছাড়িয়ে এলাম আমরা বাসটোগনের (Bastogne) পথে। এক জায়গায় দেখি, কতকগুলি কামান পড়ে আছে। কামানগুলি জার্মানদের। বিরাট আকারের কাঁকড়াকে যেমন দেখায়, কামানগুলিকেও সেইরকম দেখতে। চারদিকে তাদের নল। আমেরিকান সৈন্যরা এগুলিকে দখল করে ১৯৪৪ সালে জার্মান সৈন্যদের পরাস্ত করে। সেইগুলিই এখন একটি প্রদর্শনীতে পরিণত হয়ে জায়গাটাকে বিখ্যাত করেছে।

সেন্ট হুবার্ট জঙ্গল হচ্ছে বেলজিয়ামের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত জঙ্গল। সপ্তম শতাব্দীতে এখানে কী একটা আশ্চর্য দৈববাণী হয়। সন্ন্যাসীর নামানুসারে তাই এই জঙ্গলের নাম হয়েছে সেন্ট হুবার্ট। সেটাও অতিক্রম করতে লাগলাম। নামুরে এলাম। মিউজ নদীর তটদেশে স্থাপিত নামুর শহরের খ্যাতনামা দুর্গদ্বার—একটা দেখবার মতো জায়গা।

ব্রাসেল্‌সের এলাকায় গাড়ি গিয়ে প্রবেশ করল।

দেখলাম, রেডিও আর টেলিভিসান স্টেশন। অদূরে বিরাট কয়েকখানা বাড়ি। আর, তাদের মাঠ ঘিরে কতকগুলো লোহার পিলার। লোহার পিলার আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লেলিহান শিখার মতো।

আবার সেই ব্রাসেল্‌স্‌ শহর।

সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড হোটেল কসমোপোলিট। আজকের রাতের মতো নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

ডিনার টেবিলে বসতে গিয়ে হাঁসের মাংস পেলাম ডিশে।

আলফ্রেডও তাই পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করলাম, ছুরি-কাঁটা রেখে দিয়ে তিনি সেটির সদ্‌ব্যবহারে মত্ত হয়েছেন ছটি হাতের সাহায্যে। আমিও তাঁর পন্থা অবলম্বন করলাম। অবশ্য ছ হাতে নয়। এক হাতে।

খাওয়ার এক ফাঁকে আলফ্রেড ছুটে এলেন আমাদের কাছে।—কেমন চলছে?

বললাম, ভালো। ধন্যবাদ।

তোমার কেমন চলছে?—মিস কটনের প্রতি আলফ্রেডের প্রশ্ন।

কটন পাশের চেয়ারেই বসেছিল। তাকে আলফ্রেড একটু সমীহ করছেন, মনে হল। মিস কটন আলফ্রেডের কাছে নতিস্বীকার করেনি।

যেমন চালাচ্ছ।—মিস কটনের জবাব।

জিগ্যেস করলাম, মিঃ জিনকে দেখছি না যে?

জিন আমাদের বাসচালক। চমৎকার যুবক। ইংরেজী তার মাতৃভাষা নয়। মাতৃভাষা জার্মান। মা তার স্প্যানিশ। বাবা ফরাসী। খোদ ব্রাসেল্‌সেই তার বাড়ি। ইতিপূর্বে অনেকবার আলাপ হয়েছে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে কথা বলে। শুনতে মন্দ লাগে না।

আলফ্রেড বললেন, মিঃ জিন গিয়েছে তার বউকে আদর করতে···

কথা শুনে হেসে ফেললাম।

হাসবার কি আছে এতে ?—

আলফ্রেডের চোখে কৌতুক।

চুপ করে রইলাম।

আলফ্রেড মিস কটনের দিকে চেয়ে তার সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বললে, এ হাসছে কেন বলো দেখি ?

কেন হাসছে তুমিই জানো !

বউকে লোকে আদর করবে না ? কতদিন তাকে দেখেনি—কাছে পেয়ে ছেড়ে দেবে ?

মিস কটন কোনো জবাব দিল না। শুধু চেয়ে রইল। মুখে তার চাপা গাম্ভীর্য।

আলফ্রেড বললেন, খেয়ে উঠে যেন ঘরে ঢুকো না ! জিন ফিরে এসে তোমাদের ব্রাসেল্‌স দেখাতে নিয়ে যাবে। আমি যেতে পারব না। ব্রডওয়েস্‌-এর গভর্নর আসছেন লণ্ডন থেকে—ফ্লাই করে। তাঁকে রিসিভ করতে যেতে হবে।

প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি অতিরিক্ত পয়সা আদায় করলেন।

তারপর ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়।

খেয়ে উঠে সকলে মিলে রাস্তায় দাঁড়ালাম। জিনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেথেল বললে, তোমাকে একটা কথা বলতে পারি কি ?

স্বচ্ছন্দে।

আমাদের ইংলণ্ডের নিয়ম হচ্ছে, যার কাছ থেকে সামান্য কিছুও উপকার পাবে, তাকে বকশিশ দেবে। আমরা এতগুলো লোক আলফ্রেডের কাছ থেকে উপকার পেয়েছি। তাঁকে কিছু দেওয়া উচিত।

এ নিয়ম ইংলণ্ডের কেন—আমাদের দেশেরও !

কথায় হারব কেন ? ব্রিটিশ তার দেশপ্রেম দেখাতে পারে—আমি পারি না ?

বললাম, নিশ্চয়। কত দিতে হবে বলো।

সকলে এক পাউণ্ড করে দিচ্ছে।

আমিও দেব।

এক পাউণ্ডের নোট একখানা তুলে দিলাম বেথেলের হাতে।

বেথেল ধন্যবাদ দিল। বললে, তুমি কিছু না দিলেও ভাবতাম না! তোমার অনেক খরচ।

কিছু নয়। কিছু নয়।—কথাটা উড়িয়ে দিলাম।

উড়িয়ে দিলেও মন প্রবোধ মানল কই? ভারতবর্ষের কথা মনে এল। ইংলণ্ডে এক পাউণ্ড অবশ্য কিছু নয়। পাঁচ টাকার নোটের মতো। একবার ভাঙালেই শেষ। ভারতবর্ষে কিন্তু এক পাউণ্ডের দাম অনেক। তেরো টাকা সাঁইত্রিশ নয়া পয়সা। ইংলণ্ডে ন্যূনতম মাইনে—সপ্তাহে সাত পাউণ্ড। অর্থাৎ একশো টাকার মতো। এক মাসে চারশো টাকা। আর ভারতবর্ষে? ভারতবর্ষে সারা মাস খাটলেও ন্যূনতম মাইনে কি একশো? ভুক্তভোগী মাত্রেরই তা জানা আছে! একটা সংবাদপত্রের অফিসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অবশ্যই উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবী—একথা মনে করা চলে। মালিকের লাভের অঙ্ক তিলে তিলে স্ফীত হয়। অথচ সেই সাংবাদিকদের সংসারের দিকে একবার তাকান। তাঁদের জামা-কাপড়ের অবস্থাটা একবার লক্ষ্য করুন। জাগতিক সকল রকম বিপর্যয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই যেন তাঁদের জন্ম। ইংলণ্ডের একটা সামান্য লোক জুতো পালিশ করেও যা না রোজগার করে, আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ একটি শিক্ষিত মাস্টার কি উকিল—সে পয়সা চোখে দেখেন কিনা সন্দেহ। আর ভারতবর্ষেরই সেই কষ্টার্জিত পয়সা কেমন সহজে পাউণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে হাত থেকে চলে গেল। প্রশ্ন হল ইজ্জৎ রক্ষার!

জিন এল তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে।

স্ত্রীকে দেখতে বেঁটে, রোগা। তার বয়েস হয়েছে মনে হল। রঙ অবশ্য ফর্সা। জিনের তুলনায় স্ত্রী এমন কিছুই নয়। তবে বেশ ভদ্র। আমরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম। বললাম, তোমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম।

মিসেস জিনও বললে, তোমায় দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

তারপর বাসে চড়া।

মিঃ জিন বসল ড্রাইভারের আসনে। মিসেস জিন তার পাশের সীটে।

সন্ধ্যায় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌সকে দেখলাম রানীর বেশে। দিনের আলোয়ও ব্রাসেল্‌স শহর দেখেছি। দিনের ব্রাসেল্‌স যেন অবসাদগ্রস্ত, রাতের ব্রাসেল্‌স অনন্যা। কোথাও কোথাও লণ্ডনের পিকাডিলির মতো আলোকসজ্জা। কোথাও কোথাও একেবারে দ্বিতীয় প্যারিস। সুন্দরী নববধূর মতো যেন সে বাসরঘরে প্রবেশ করছে। ঝলমল করছে তার রূপ। তার অগ্নিপাটের শাড়ি। তার শালীনতা।

আলফ্রেড নেই। জিনই গাড়ি চালাতে লাগল। তাঁর হয়ে বক্তৃতা দিতে লাগল ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে। জিনের জন্মভূমি ব্রাসেল্‌স। ব্রাসেল্‌সের ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ। যত সে জানাতে চায়, বোঝাতে চায়, ততই সে গর্বিত হয়ে ওঠে। কদমের মতো রোমাঞ্চিত হয়। এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। দোষ দেওয়া চলে না। তার দেশ দেখতে এসেছে বাইরের লোক—এটা কি তার কম আনন্দ? দলের লোক—না হয় ইংলণ্ড থেকে গিয়েছে। আমি? আমি তো আর ইংলণ্ডের বাসিন্দা নই। আমি এসেছি সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। আর কোনো দিন আসব কিনা—সন্দেহ। আর কোনো ভারতবাসী তার দেশ দেখতে গিয়ে তার মুখের কথা শুনবে কিনা—সে জানে না। অতএব, সে রোমাঞ্চিত হবে না? সে এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করবে না?

যতদূর পারল, দেখাতে লাগল। বোঝাতে লাগল। কোথাও নেমে, কোথাও বাস থেকেই।

যা দেখলাম—সেও দেবতাদর্শনেরই শামিল।

গির্জা, রাজার বাড়ি, রাজন্যবৃন্দের বাসস্থান—এক-একটি দুর্গসদৃশ। সেসব বাড়ির কী অদ্ভুত কারুকার্য, কী সুন্দর তার খিলেন, কী তার অপরূপ চূড়া! কত প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য যেন নবীনের মতো শোভা পাচ্ছে।

একটি পিতলের স্ত্রীমূর্তি। শায়িত অবস্থায় এক জায়গায় নিবদ্ধ। তার সমস্ত শরীরটা কালো। একখানা হাত শুধু অসম্ভব চকচকে। শুনলাম, এককালে নাকি ব্রাসেল্‌সে মহামারী দেখা দেয়। ধর্ম-যাজকরা ঘোষণা করেন, এই মূর্তির হস্ত স্পর্শ করলে নির্ভয় হওয়া যায়। লোকে তাই করে। নির্ভয় হয়। প্রবাদ আছে, এই মূর্তির হস্ত স্পর্শ করে প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয়। তা দৈনিক কত লোক যে মূর্তিটির হাতে হাত মিলিয়ে যায়, তার হিসেব নেই। হাতখানা তাই জীবন্ত হাতের স্পর্শ পেয়ে চকচক করছে। আমরাও স্ত্রীমূর্তির হাতে হাত দিলাম। মানুষ মাত্রেরই মনোবাঞ্ছা আছে। কার নেই?

পাথরের একটি উলঙ্গ বালকমূর্তি। বড় সুন্দর দেখতে। টাউন হলের বিরাট বাড়িটিও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি বিরাট মনুমেণ্ট, দূর থেকেই নজরে পড়ে।

মেন স্কোয়ার অব ব্রাসেল্‌স একটি বিরাট পার্ক। সৌন্দর্য-খ্যাতিতে ফ্রান্সের ভেরসাই উদ্যানেরই সমতুল্য। স্টক এক্সচেঞ্জ সৌধটি সিনেট হলের মতো।

স্টেশনের দিকে যেতে গেলে চোখে পড়ে একটি যৌথ মূর্তি। ইংরেজ আর বেলজিয়াম সৈন্য—এক সঙ্গে যুদ্ধে চলেছে। এক সঙ্গেই যুদ্ধে মরেছে। তাদের অমর স্মৃতিস্তম্ভ এই বাফার রাজ্যে।

কলকাতার মতো সুন্দর ট্রাম চলে যায় সামনে দিয়ে। ট্রামের রঙ নীল, অপরাজিতার মতো। ভিতরে উজ্জ্বল আলো।

কংগ্রেস-কলোনিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। হোমের আগুনের মতো। কিন্তু হোমের আগুনের চেয়েও শিখা এর উর্ধ্বগামী। শুনলাম, এ-আগুন নিববে না। যতদিন মানুষ থাকবে, এ-আগুন জ্বলবে। যতদিন সভ্যতা থাকবে, সৃষ্টি থাকবে, এ-আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতেই হবে। যত টাকা খরচ হয় হোক। হিটলারের সময়ে এ-আগুন নেবানো হয়নি। আইসেনহাওয়ারের সময়েও এ-আগুন নেবানো হবে না। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে, তাদেরই আত্মার উদ্দেশে চিরন্তন শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্র এই বেলজিয়ামে, 'ককপিট অব ইওরোপে', এই আগুন।

জাস্‌টিস কোর্টের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি পুরু, গম্বুজওয়ালা ক্যাথিড্রল আছে, জাস্‌টিস কোর্ট তাদের মধ্যে অন্যতম। এ বাড়ির উপরও উপর্যুপরি বোমাবর্ষণের পালা চলেছিল। খানিকটা নষ্ট হয়। সবটার ধ্বংস-সাধন অবশ্য সম্ভব হয়নি। এতদিনে ক্ষতির অংশ পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা হয়েছে।

রাত দশটায় শহর দেখা শেষ হল।

ঢুকলাম এসে 'রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডস্-কাফেতে'।

দেখি, আমাদের সংবর্ধনা করবার জন্য আলফ্রেড দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দরজা-গোড়ায়। ঢুকতেই সযত্নে সকলকে বসবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিতে লাগলেন।

কী ব্যাপার?

ব্রডওয়েসের গভর্নর এসেছেন লণ্ডন থেকে এয়ারে। তিনি খোদ উপস্থিত এই রেস্তরাঁয়।

কে তিনি?—প্রশ্ন করলাম।

একটি মেদবহুল শ্বেতাঙ্গিনীকে ঘিরে কয়েকজন ভদ্রলোক মদ খাচ্ছিলেন। মদের সঙ্গে সিগারেট। তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে আলফ্রেড বললেন, এর মধ্যে আছেন। পরে আলাপ কোরো।

গভর্নর যখন আছেন, তখন তাঁর সম্মানের জন্য স্বাস্থ্যপান করাও প্রয়োজন।

সকলেই মদ নিল। আমি বিয়ার···

একটি চিত্রকর ছিলেন কাফেতে। বৃদ্ধ এবং গরিব। আমাদের কাছে উঠে এসে ছবি বিলোতে লাগলেন। টুকরো টুকরো কাগজে কাঠকয়লায় আঁকা ছবি। কয়েকখানা গ্রহণ করে তারিফ করতে লাগলাম। ছবিগুলো আঁকা হয়েছে মানুষের মুখের নানা কাঠামো নিয়ে। হাত দিয়ে ধরলে কাগজ থেকে কালো ছোপ উঠে আসে। ফেরৎ দেব কিনা ভাবছি, পিটার, বেথেল চিত্রকরকে পয়সা দিতে লাগল।

পয়সার জন্যই চিত্রকর উঠে এসেছিলেন, বুঝলাম। কিছু দিতে হল।

কাফে নীরব নয়। বেশ সরগরম। মাঝখানে ক্যারামবোর্ডের মতো একটা ছোট বোর্ড। ঘুঁটির বদলে সেখানে গুলি। আর, হাত দিয়ে নয়, হাওয়া দিয়ে সেটাকে গর্তে ফেলবার চেষ্টা চলেছে। মোটরের ভেঁপুর মতো চার কোণে চারটে বেলো। সেই বেলো টিপে টিপে বাহাদুরি। যারা খেলছে এবং দেখছে—উভয়েরই আনন্দ।

গভর্নর এসে এ অধমের সামনে দাঁড়ালেন।

দাঁড়িয়ে উঠে করমর্দন করলাম।

গভর্নর একটি সৌম্য-শান্ত ইংরেজ যুবক। মাথায় টাক। মুখ দেখলে মনে হয়—বড় গোবেচারা। পরনে দামী পোশাক।

হেসে বললেন, বড় খুশি হলাম তোমাকে দেখে। কেমন লাগল এই ভ্রমণপর্ব ?

বললাম, ভালো। আলফ্রেডের বইয়ে আমার মতামত লিখে দিয়েছি।

আলফ্রেডের কাছে একখানা বই থাকে। যাত্রা যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে, আলফ্রেড সেটিকে কাজে লাগান। যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। হ্যাভ্ এ গুড্ জব। আলফ্রেড অনেক বক্তৃতা দেন। সঙ্গীদের সম্মোহিত করে নিজের পক্ষে খানিকটা ভালো কথা লিখিয়ে নেন। আজ সকালে তাই আমাকে দিয়েও খানিকটা ভালো কথা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

আমার সামনে আর গভর্নর বইটা দেখলেন না। বললেন, প্রথম দিকটায় একটু অসুবিধা হয়, শুনেছিলাম। যাই হোক, আমাদের কাজে তুমি প্রসন্ন তো ?

খুব। অশেষ ধন্যবাদ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আলফ্রেড এসে কানে কানে বললেন, বসে পড়ো।

আমি বসবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর চললেন অন্য লোকের কাছে।

তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভালোভাবে কথা বললেন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন মিস কটনের সামনে।

অনেকক্ষণ ধরে উভয়ের কথাবার্তা হল। কী কথা হল, শুনতে পাইনি। তবে মিস কটনের নাম যে গভর্নরের কানে ইতিপূর্বে পৌঁছেছিল এবং তার সম্বন্ধে অনেক কিছু তিনি শুনেছিলেন, সেটা অনুমান করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। যেরকম আগ্রহ নিয়ে গভর্নর তার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেটাই তার উপযুক্ত প্রমাণ।

অত্যুজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোয় মিস কটনকে যেন রানীর মতো দেখাচ্ছিল।

দেখলাম সেই চিত্রকর আবার উঠে এসেছেন। বিশেষ করে আমারই কাছে। আবার ছবি বিক্রি করতে চান। এবার রীতি-মতো বিরক্ত হলাম। একটা সক্ষম বৃদ্ধের এ কি বেলেল্লাপনা! আমাকে ধনী পাকড়েছেন নাকি? লোভ বেড়ে গিয়েছে? বারেবারে তাঁর ঐ কাঠকয়লায় আঁকা ছবি কিনতে হবে?

সরাসরি অগ্রাহ্য করতে হল।

কিন্তু জিনের কাছ থেকে যা শুনলাম, সে এক বিচিত্র গল্প।

প্যারিসের এক চিত্রশালায় যৌবনে ঐ চিত্রকরটি নাকি কাজ করতেন। চিত্রশালার মালিক ছিলেন এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক। অগাধ পয়সার অধিকারী।

চিত্রকরের সাংসারিক জীবন সুখের ছিল না। সামান্য কিছু যা আয় করতেন, তাতে তাঁর নিজের খরচই চলত না। তারপর তাঁর স্ত্রী···

রোজই খিটিমিটি বাধত বাড়িতে।

এমন কি প্রতিবেশীদের পর্যন্ত দৌড়ে আসতে হত সাহায্য করতে। ঝগড়া মেটাতে।

একদিন কি সূত্রে যেন চিত্রশালার মালিক এলেন ঐ চিত্রকরের

বাড়িতে। সহসা চোখাচোখি হয়ে গেল এক সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতীর সঙ্গে। শুনলেন, এই-ই নাকি চিত্রকরের বিবাহিতা স্ত্রী।

মালিক কয়েকদিন পরেই চিত্রকরকে কি একটা কাজ দিয়ে লণ্ডন পাঠালেন।

কাজটা করে চিত্রকর যখন ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে, দেখলেন স্ত্রী নেই। হয়তো কোনো কাজে গিয়েছে, পরে আসবে—এই ভেবে তিনি মালিকের কাছে গেলেন তাঁর কাজের হিসাব দিতে।

গিয়ে দেখলেন, মালিকের ঘর বন্ধ। রুদ্ধ দরজার সামনে এক সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে।

প্রহরী তাঁকে থামতে বললে।

চিত্রকর বললেন, ঘরে কে আছে?

তোমার স্ত্রী আর মালিক।

আমার স্ত্রী!

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও এতটা আশ্চর্য হতেন না চিত্রকর, যতটা হলেন এই কথা শুনে। জিগ্যেস করলেন, সে স্বেচ্ছায় এসেছে, না তাকে ধরে আনা হয়েছে জোর করে?

জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

চিত্রকরের মুহুর্মুহু সশব্দ ও উত্তেজিত পদাঘাতে তখনই দরজাটা নড়ে উঠেছিল।

মালিক বেরিয়েও এসেছিলেন। ভয়ে জড়সড় হয়ে নয়। নির্ভীক যোদ্ধার মতো। হাতে তাঁর পিস্তল।

এসেই একটা জোরালো ঘুষি কষিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রকরের নাকের উপর। ঘুষি কষিয়ে বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো। জোর করে ধরে আনলেও তোমার জীবনের বিনিময়ে ওকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে, ও স্বেচ্ছায় এসেছিল আমার ঘরে। বেশি বাড়াবাড়ি করতে এসো না। মরে যাবে

একেবারে। ওর হাতে তোমার সংসার-খরচের মাসিক টাকা গুঁজে দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী তখনো মালিকের খাটের উপরই শায়িত। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা সাজানো বাগানের উপর দিয়ে সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে। বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গিয়েছে একটি কমনীয় টিউলিপ।

একটা মদের বোতল চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় মেঝের কার্পেটের উপর ছড়ানো।···

চিত্রকর মাথা হেঁট করে নিজের বাড়িতে চলে এসেছিলেন।

সমস্ত রাত কী নিরুচ্চার বেদনার মধ্য দিয়ে কেটেছিল তাঁর, সেটা একমাত্র চিত্রকরই জানেন। নাক দিয়ে তাঁর টোসা টোসা রক্ত ঝরেছে। পেটে পড়েনি এক টুকরো রুটি বা আধ কাপ কফি।

সকালে পাগলিনীর মতো তাঁর স্ত্রী এসে দেখা দিয়েছিল ঘরে। কী যেন বলতেও চেয়েছিল অস্ফুট স্বরে। চিত্রকর শুনতে চাননি। বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে।

তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে। চিত্রকর কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন, কে রেখেছিল তাঁকে, সে-খবর তিনি কোনো দিন কাউকে দেননি। লোকেও তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি।

সেই চিত্রকরকেই মাসখানেক হল আবার দেখা যাচ্ছে এই ব্রাসেল্‌সে!

লোকে তাঁর ছবি কেনবার ছলে কিছু-কিছু সাহায্য করে মাত্র।

শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

পুনরায় ঐ চিত্রকরের হাতে কিছু দিতে হল। সকলেই দিল।

বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি ছিল না।

শহরের আলো দেখতে দেখতে হোটেলের ঘরে এসে উঠলাম।

সহসা একটা জানালা আবিষ্কার করে ফেললাম ঘরের শেষ প্রান্তে। খোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে খুলেও গেল সেটা। সেখান

থেকে একতলার সবটুকুতেই দৃষ্টির জরিপ চলে। আর যা দেখলাম, দেখা মাত্রই ভয় হয়।

ঘরের বাইরে এলাম। দেখা হয়ে গেল মিসেস ক্যানাডির সঙ্গে।

ক্যানাডি বললে, ঘুমোওনি ?

সে প্রশ্ন তো আমারও !

এইবার গিয়ে শুয়ে পড়ব। ফাঁকে এসেছিলাম।

সভয়ে যা দেখেছি, বললাম।—জানালা খুলতে গিয়ে একটা গোলমাল শুনি। নিচের তলায় নিগ্রোর মতো দুটো লোক এক যুবতীকে তাড়া করেছে। বোধ হয় খুন করবে। সশব্দে কয়েকটা কাঁচের ডিশও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

মিসেস ক্যানাডি হেসে উঠল আওয়াজ করে।—এই ব্যাপার ? এ হোটেলে আরো একবার এসে থেকেছি। কি জানো ? ওটা হচ্ছে ওদের রসিকতা। সমস্ত দিনের পর কাজকর্ম চুকে গেলে চাকরবাকরেরা একটু ইয়ার্কি করে। ওরা মনে করে, আমরা বুঝি সব ঘুমিয়ে পড়েছি। এটা হচ্ছে কনটিনেণ্ট।

শুভরাত্রি জানিয়ে মিসেস ক্যানাডি অদৃশ্য হল।

'শেষ হল তোর অভিযান।'

আমাদের যাত্রার আজ শেষ দিন। পূজার আজ বিজয়া।

সকাল থেকেই সকলের মন কেমন করছে পরস্পরের জন্য। আগামী কাল ঘুম থেকে উঠে আর আমরা পরস্পরকে দেখতে পাব না। তখন অন্য পৃথিবী। অন্য পরিবেশ। আবার সেই কঠিন, কর্মময় জগৎ। আবার সেই ঘানি টানবার দুরত্যয় দুঃস্বপ্ন। আবার সেই দাসজীবনের দৈনন্দিন দাসত্ব। দাসত্ব ছাড়া কি বলব? অন্য জায়গার চাকরি আমি দেখেছি। কিন্তু ইংলণ্ডের চাকরি অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত কঠোর। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করেই কাজে গিয়ে বসো। দুপুরে এক ঘণ্টা লাঞ্চের ছুটি। সন্ধ্যায় ফিরে এসো মড়ার মতো ক্লান্ত হয়ে। কী মেয়ে, কী পুরুষ—সকলেরই এই হাল! যারা চাকরিতে যেতে পারে না, ঘরে পড়ে থাকে, তাদের আর দুঃখের শেষ নেই। তারা যেন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। চাকরি মেলেও এখানে প্রচুর। কেউ বেকার নয়। কর্মহীন নয়। সকলেই সময়ের সদ্‌ব্যবহার করে। কিন্তু কোঁচা বড় করতে গিয়ে কাছা ছোট হয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে সংসার-জীবন। ভেঙে পড়ে সংসারের শান্তি। আমরা বাঙালি। হাজার দুঃখ-কষ্টে মানুষ হলেও আমাদের একটা দুর্দান্ত লালসা আছে সংসারের প্রতি। সংসারের শ্রী—সংসারের শান্তির প্রতি। ইওরোপের জীবন—হোটেল-জীবন, যান্ত্রিক জীবন। এরা জানে না, কাকে বলে সংসার, কাকে বলে সংসারের শান্তি। আর, এত এগিয়ে গিয়েছে এরা যে, আর ফিরে যাওয়া চলে না সেই পুরানো কালের গণ্ডির মধ্যে। শান্তির নাম করে এরা খায় মদ। এরা করে আত্মপ্রবঞ্চনা। দেশের নাম করে এরা প্রাণ দেয় ক্যাপিট্যালিস্টদের ষড়যন্ত্রে। ক্যাপিট্যালিস্টদের মন্ত্রণায়।

যাই হোক, কদিন আমরা বেশ একটি মনোরম ব্যূহ রচনা করেছিলাম। নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছিলাম নানা সুখ-দুঃখের ইতিহাস, নানা স্নেহ-মমতার বন্ধন। আগামীকাল সকালে সেটা চিরকালের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কোথাও লেগে থাকবে না তার একটুকু চিহ্ন পর্যন্ত। সেই কথা স্মরণ করে সকলেই সকলের জন্য ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। অনেকে আমার ঠিকানা নিল। আমিও অনেকের ঠিকানা নিলাম। জানি, একবার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে কেউ কারো নয়। ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমরা অনিশ্চিত। অথচ ভবিষ্যৎই তো সব নয়। আমাদের বর্তমান আছে। বর্তমানের ভালোবাসা আছে। বর্তমানের নিঃসংশয় স্বীকৃতি আছে। সে কথাই বা এড়িয়ে যাব কেমন করে ?

সকাল নটায় বাসে উঠলাম। যাত্রা করলাম।

দিনের আলোয় ব্রাসেল্‌স শহরের অন্য রূপ, অন্য অবসাদ। শহর আমাদের বিদায় দিল উদাসীনের মতো।

আবার সেই পথ, বাড়ি, দোকান, মাঠ, গাছ, বাগিচা······এম, পাইন, বার্চ, পপলার, মালবেরি, টাইবার্ন গাছের ছায়া। সংরক্ষিত অরণ্যে কাঠবিড়ালীর সতর্ক কর্মতৎপরতা।

বেলা বারোটায় এলাম অস্টেণ্ডে। সামনেই স্টেশন।

মিঃ জিন আমাদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নেবে। তার সঙ্গে তার স্ত্রীও এসেছিল ব্রাসেল্‌স্ থেকে।

আমরা উভয়ের সঙ্গেই করমর্দন করলাম। প্রত্যেকেই মিঃ জিনের কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে লাগল। আমিও করলাম।

সকলেই বললে, তুমি সঙ্গ দেওয়াতে তোমাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে।

আমিও বললাম, তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেভাবে বিরাট বিরাট পাহাড়ের উপর তুমি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ,

তোমার কথা নিশ্চয় স্মরণ করব। তোমার ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। তোমার বন্ধুত্ব বিশেষ গর্বের সামগ্রী।

মিঃ জিন গাঢ় স্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে সস্ত্রীক গাড়ি ঘোরাল। বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মিঃ জিনকে সেই বিশেষ স্থানে কিছু দেওয়া হল না বটে, তবে শুনলাম সকলের পক্ষ থেকে তাকে নাকি গতকাল রাত্রে একটা মদের বোতল উপহার দেওয়া হয়েছে। সকলের শ্রদ্ধার অঞ্জলি হিসাবে।

জিন চলে যাবার পরই মনে হল, বিদায়ের পালা ঘনিয়ে আসছে। একা জিন নয়—সকলেই একে একে খসে পড়বে। জিনের বিদায়ে তারই সঙ্কেত।

আমাদের হাতে তখন তিন ঘণ্টা সময়। প্রচুর সময়। তিন ঘণ্টা পরে স্টীমার ছাড়বে। সে স্টীমার যাবে ডোভারে।

আলফ্রেড বললেন, যার যেখানে ইচ্ছে ঘুরে আসতে পার। আড়াইটের সময় সকলকে যেন পাই এই স্টেশনের ধারে।

অনেকেই ঘুরতে বেরিয়ে গেল।

কেবল আমরা কজন আলফ্রেডের পিছু নিলাম। পিটার, বেথেল, মিচেল আর আমি। গিয়ে উঠলাম সেই স্ট্র্যাণ্ড হোটেলেই।

হোটেল-মালিক সেই স্ত্রীলোকটিই বসে আছে। যাবার বেলায় যাকে দেখেছিলাম। বাঘের মতো তার চোখ দুটো জ্বলছে। মুখের মধ্যে আর কিছু নয়, প্রধান হয়ে উঠেছে তার চোখ। পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে অনেক আঘাত পেলে, অনেক বিশ্বাসঘাতকতার ঘা খেলে তবে হয় চোখের এই সতর্ক চেহারা।

স্ত্রীলোকটির কাছে আলফ্রেড বসে গেলেন মদ খেতে।

আমরা গিয়ে উঠলাম দোতলায়।

ত্বরিত একটি মেয়ে এগিয়ে এল আমাদের সাহায্যে।

মেয়েটির মুখশ্রী এত সুন্দর যে একবার দেখলে, তাকে আর-

একবার দেখতে ইচ্ছে করে। পরনে কালো স্কার্ট। তাতে যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ-সৌন্দর্য। দুখানি নগ্ন বাহু। পায়ে জুতো। কিন্তু অনাবৃত পা আর মুখ থেকে এমনই একটি রক্তিম, উজ্জ্বল আভা বেরোচ্ছে যা অনির্বচনীয়। কত অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দরীরই তো দেখা পেলাম এ পর্যন্ত। তাই ভাবতে লাগলাম, আমাদের দেশে বড় ঘরে যদি এরকম একটি শ্বেতবরনী তরুণী থাকে, তার জন্য আসে উচ্চপদস্থ চাকরে, এটর্নি, জজ অথবা অফিসার! কিন্তু এখানে লাখ লাখ হোটেলে এমন কত লাখ যে শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে আছে, ঠিক নেই। তাদের জন্য জজ নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, এটর্নি নয়—সামান্য একটি প্রেমিকই যথেষ্ট।

মেয়েটি এসে সামনে দাঁড়াল।

বেথেল বললে, আমরা লাঞ্চ খেতে চাই।

তখনই মেয়েটি মেনু এনে হাজির করল।

অর্ডার করার কিছুক্ষণ পরেই একে একে ডিশ এসে হাজির হতে লাগল টেবিলে। এত ত্বরিত পদে মেয়েটি পরিবেশন করে যেতে লাগল যে দেখলে মুগ্ধ হতে হয়! খেয়েও তৃপ্তি আসে। মাঝে মাঝে যখন সে পরিত্যক্ত ডিশগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, একটি অস্পষ্ট ঘেমো গন্ধের আভাস পাচ্ছিলাম তার গা থেকে। যাকে দেখতে সুশ্রী, তার দেহের ঘেমো গন্ধও সহনীয়। ঘেমো গন্ধের সঙ্গে একটু ইভনিং প্যারিসের আমেজ।

একটা বড় ভাজা মাছ টেনে নিলাম মুখের কাছে। রেখে দাও তোমার ছুরি-কাঁটা! বহুদিন পরে মনে হল যেন টাটকা মাছ খাচ্ছি।

বেথেল, মিচেল অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমার হাতে করে খাওয়ার কায়দাটা। মনে হল, তারাও ঐভাবে খেতে পারলে যেন খুশি হত।

বেরিয়ে আসবার সময় দেখি, আলফ্রেড তখনো বসে আছেন

সেই স্ত্রীলোকটির সামনে আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় বকবক করে কি-সব বকে চলেছেন।

হাতে তখনো অনেক সময়। কী আর করা যায়? এদিক-সেদিক বেড়াতে লাগলাম। কয়েকটা দোকানে ঢুকলাম। অনেক দোকান সমুদ্রের ধারে। আর অনেক হোটেল। হোটেলগুলোর মধ্যে 'লুসিটেনিয়ার' জাঁকজমকটাই যেন চমকপ্রদ।

মাছধরা দেখলাম। সমুদ্রের খাঁড়ি। কিনারায় নোঙর করা আছে অনেক নৌকো। জলের উপর ছোঁ মারবার চেষ্টায় আছে এক রকমের মাছরাঙ্গা। কতকটা শকুনির মতো দেখতে। প্রচুর জাল শুকোচ্ছে জেটির ধারে। জেটির প্রান্তসীমা ধৌত করে যাচ্ছে উদ্বেলিত নীলসিন্ধুর জলধারা। জেটির উপর কাঠের ঘর। এক একটা জেলে-নৌকো এসে জেটিতে ঠেকছে আর মাছ তুলছে জেলেরা। যেন মাছির মতো ভিড় লেগে যাচ্ছে লোকের। আর সমুদ্র থেকে যে কত রকমেরই মাছ উঠছে! এইসব হোটেলগুলো থাকতে জেলেদের রুটি মারে কে? যেই মাছ ওঠে, বাইরের লোক নয়—হোটেলওয়ালারাই এসে আগে সেগুলো কিনে নিয়ে যায়। মাছ যখন কাটা হয়, টপটপ করে তাজা রক্ত পড়তে থাকে তাদের গা থেকে।

কয়েকটা হোটেলের সামনে মাছকাটাও দেখলাম।

স্টীমারে ওঠবার আগে আবার পাসপোর্ট দেখাতে হল। বেলজিয়ম-পুলিশ পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিল। কাস্টামস্-এর মাল দেখবার কথা। কিছুই তারা দেখল না।

প্রায় সাড়ে তিনটের সময় স্টীমার ছাড়ল।

ভিতরে তিল ধারণের স্থান ছিল না। লোকে লোকারণ্য। আপার ডেক থেকে নিচে অবধি মানুষ আর মালপত্রের ভিড়। শুধু মানুষ নয়, তার সঙ্গে গোটাকতক কুকুর। আর, কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল—কে জানে!

তেমনি গরম! গল্গল্ করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। উপরের দেহে চারটে জামা। গেঞ্জি, শার্ট, ওয়েস্ট কোট, কোট।

মিস কটন আর মিস জোন্স্ আমাকে আগলে নিয়ে উঠেছিল স্টীমারে। পটপট করে তিনখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেরা বসল, আমাকে বসাল। মিস কটনের পাশেই আমি পেরেছিলাম বসতে। রুমাল দিয়ে বারবার কপালের ঘাম মুছছিলাম। সেটুকু লক্ষ্য করে মিস কটন বললে, গরম হচ্ছে নাকি?

ভয়ানক।

এক রাশ জামা চড়িয়ে রেখেছ কেন? খুলে ফেলো না!

নিজে উঠে মিস কটন আমাকে কোটটা খুলতে সাহায্য করল। গা থেকে ওয়েস্ট কোটটাও খুলে ফেললাম। শুধু রইল ভিতরে গেঞ্জি আর উপরে নাইলনের শার্ট। শার্টটা কাঁচের মতো চকচক করছিল।

মিস কটন পাশে বসে পড়ে বললে, এইবার মানিয়েছে তোমাকে! সত্যি, বেশ ভালো লাগছে।

ধন্যবাদ! কালোকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।

কালো? ওটা তোমার মনের ভুল। গায়ের রঙ কটা হলেই সুন্দর হয় নাকি? তোমার কেমন চমৎকার মাথার চুল!

আহা! লজ্জা দিও না।

লজ্জা দেব কেন? সত্যি কথাই বলছি। এইরকম কালো চুল আমরা খুব পছন্দ করি।

মিস কটন চট্ করে পাউডার-কেস খুলে তুলির সাহায্যে খানিকটা পাউডার ঘসে নিল মুখে। তারপর বললে, তুমি একটু মাখবে নাকি?

অবাক কাণ্ড! বললাম, আমি কি মেয়েছেলে যে, পাউডার মাখব?

মেয়েছেলেরাই পাউডার মাখে? পুরুষ মাখে না?

মাখবে না কেন? মাখলে আমাকে নিগ্রোর মতো দেখাবে।

নিগ্রোকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

তোমার?

মিটিমিটি হাসতে লাগল মিস কটন। জবাব দিল না।

বললাম, ইওরোপের সর্বত্র তো প্রচুর নিগ্রো দেখতে পাওয়া যায়। এরা কত সুন্দর-সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েরাই বা কি দেখে এদের বিয়ে করে, বুঝতে পারি না তো!

যাকে যার মনে লাগে!

মিস কটন সস্মিত মুখে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার অত রাগ কেন? তুমি তো বিয়ে করোনি। তোমার কি ইচ্ছে, এদেশীয় মেয়েকে বিয়ে করবে?

পালটে নিলাম কথাটা। বললাম, ভীষণ গরম আজ।

একটু জল খাও।

ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল গড়াল মিস কটন। দিল আমাকে। কয়েক মুহূর্তের ভিতর কোথা থেকে চারটে সুপুষ্ট স্যাণ্ডুইচ বার করল। অনেকগুলো আপেল। বললে, খাও।

একটা স্যাণ্ডুইচ নিলাম। আপেল নিলাম না। বললাম, আমি খেয়েছি হোটেলে। আর জায়গা নেই পেটে।

বেশ তো, একটা আপেল খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

পরে খাব। কিছু মনে কোরো না। রেখে দাও তোমার কাছে।

রেখে আমি দিচ্ছি। পরে কিন্তু খেতে হবে।

মিস কটন তিনটে কোকাকোলা আনতে বললে মিস জোন্‌স্‌কে।

মিস জোন্‌স্‌ চলে গেল।

স্টীমারে কোকাকোলা ও মদ প্রচুর পাওয়া যায়। মদের উপর ডিউটি নেই। দামেও শুনেছি সস্তা।

মিস কটনের পয়সায় কোকাকোলা এল। সেও খেতে হল।

মিস কটন আমার হাতের উপর হাত রাখল।

বললে, ঘড়িটা তোমার দেখি, কেমন চলছে?

ঘড়ি তাকে দেখালাম। বলা বাহুল্য, সুইটজারল্যাণ্ডে দুটো ঘড়ি কিনেছিলাম।

ঘড়ি দেখে মিস কটন বললে, বেশ ভালো জাতের মনে হয়। ডোভারে নেমে তুমি আমার সঙ্গে আসবে। তুমি মাঝখানে থাকবে। আমি আর জোন্‌স্‌ তোমার সামনে-পিছনে থাকব। যদি কাস্টামস্‌ ধরে, পরিষ্কার তুমি স্বীকার করবে, দুটো ঘড়ি কিনেছ। আর বলবে, শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছ। আমার মনে হয়, তোমার কাছ থেকে তারা কিছুই নেবে না।

দেখা যাক, কি হয়।

লেডিস্‌-ওয়াচ যে কিনেছ—কাকে দেবে? তোমার তো বিয়ে হয়নি। কোনো মেয়েবন্ধু আছে নাকি?

কি উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না।

·

পায়ের কাছে আর দু-ভদ্রলোক বসেছিলেন। রঙ দেখে মনে

হচ্ছিল, ইওরোপীয় নন। তাঁরা একটা মদের বোতল খোলবার জন্য যে কাণ্ড করছিলেন, দেখলে হাসি পায়।

মিস কটনের কাছে কী একটা যন্ত্র ছিল। সেটা দিতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বোতল খুলে যাবার পর তাঁরা পড়লেন কটনকে নিয়ে।—খুব ভালো মদ মাদাম। তুমি একটু খাও।

আমি মদ সহ্য করতে পারি না। আমি খাই না।

কটন যখন উড়িয়ে দিল, তাঁরা পড়লেন আমাকে নিয়ে: তুমি একটু খাও। বড় ভালো জিনিস। ফ্রান্স থেকে আনছি।

কটন যখন খেল না, আমি খাব কি দুঃখে?

বললাম, দুঃখিত। মদ আমি খাই না। তোমাদের মদ, তোমরা খেলেই খুশি হব।

সে কি কথা? আমাদের মদ বললেই ছাড়ব?

তাঁরা বুঝেছেন, কটন যখন আমার সঙ্গিনী, আমাকে খুশি করলেই মিস কটনকেও খুশি করা যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি মিস কটন আমার সঙ্গিনী? স্নেহ নিয়ে, দয়া নিয়ে যদি কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়, তাকে কি সঙ্গিনী বলে ছোট করব?

মিস কটন মদ খাওয়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচাল। বললে, ও মদ খায় না। তোমাদের অন্য কিছু থাকে তো আমাদের দিতে পার।

দুজনের ভিতর একজন আমাদের বাদাম দিলেন। মেওয়া দিলেন।

মিস কটন, মিস জোন্‌স্ আর আমি খেতে লাগলাম।

যিনি দিলেন তাঁর পরিচয় পেলাম।—মিঃ সালিম আল মুদাল্‌লাল, এডভোকেট, বাগদাদ। চমৎকার ভদ্রলোক। পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন তাঁর বন্ধুকে নিয়ে।

মিস কটন আপেল বার করে আমাকে দিল। বললে, খাও।

অনেক হয়েছে। ধন্যবাদ। আর পারছি না।

সে কি কথা? খানিক আগে যে বললে, পরে খাবে?

মিস কটন যেন দাবড়ি দিল আমাকে। চোখ তার গোল হয়ে গিয়েছে।

বললাম, ক্ষমা করো। আপেল খেতে অরাজী নই। খেলে ওষুধও খেতে হবে। নিশ্চয় ওষুধ তোমার কাছে নেই।

খুব দুষ্টু হয়েছ তো তুমি! এদিকে তো ইংরেজী ভালো করে বলতে পার না। কথাগুলি তো বেশ পাকা লোকের মতো!

তোমার কাছ থেকে যে শিখেছি! আর ইংরেজী নাই বা পারলাম ভালো করে বলতে। যেটুকু বলি, বাংলা তো তুমি তাও বলতে পারবে না।

আচ্ছা হয়েছে!

সেই আপেল না খাইয়ে মিস কটন কিছুতেই ছাড়ল না।

পিটার, বেথেল, মিচেল খুঁজতে খুঁজতে আসল জায়গায় এসে হাজির।

হ্যালো, তোমরা এখানে?

মিস কটন, মিস জোন্‌স্ তাদের অভ্যর্থনা জানাল। তারা ভিড় ঠেলে আমাদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে গেল। একজনকে বসবার সুযোগ দিয়ে আমি চলে গেলাম ঘুরতে।

অরণ্যে ঘোরাও সহজ মনে হল; তবু এই স্টীমারে নয়। এত বেশি জনতা, এত বেশি ছেলে-মেয়ে। যারা ইংলণ্ড থেকে গিয়েছিল—অনেকে ফিরছে। যারা যায়নি, দেশ-বিদেশ থেকে তারা আসছে ইংলণ্ডে। এক একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতী। 'পর্যাপ্তপুষ্প স্তবকাবনম্রা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।' মনে হল, পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্পভারে অবনতা একটিমাত্র পল্লবিনী লতাকেই চাক্ষুষ করলাম না, এরকম অনেকগুলি লতারই দর্শনলাভ করলাম। তার সঙ্গে শত শত প্রিয়দর্শন যুবক। রত্নের সঙ্গে যেন কাঞ্চনের সমাবেশ। তারা হাততালি দিতে দিতে গান গাইতে শুরু করেছে।

কেউ অথবা কারা ঝোলাঝুলি নিয়ে ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিল সমুদ্রতীরে, নয়তো কোনো হ্রদের ধারে। যুবকদের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে। টয়লেট রুমে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে তারা সভ্য হয়ে বেরোচ্ছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মাথায় কদিন তেল-জল পড়েনি। তারা কেশবিন্যাস করে ভদ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেউ বা কারা চিৎকার করছে। আনন্দের, কলহাস্যের চিৎকার। সমস্ত স্টীমার জুড়ে একটা চঞ্চল জীবনবন্যা। একটা উদার-উন্মাদ অভ্যুত্থান।

কয়েকজন বাঙালি ছেলেমেয়েকে দেখলাম। তারা সাধ্যমতো নিজেদের জাতভাইদের দেখলে কথা বলে না। ইংরেজদের সঙ্গে মিশে সায়েব-মেম হয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু গায়ের রঙটা যাবে কোথা? মেয়েদের হাঁড়িখাওয়া মুখগুলো মোটেই মনে রাখবার মতো নয়। কথা বললে পাছে ঝগড়া হয়, অপমান করে বসে, এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বোধ করলাম। এদের বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছিলাম ইতিপূর্বে—ইণ্ডিয়া হাউসের হোটেলে, লাঞ্চের সময়। কে কত ভজাভজি করতে পারে, একে অপরের ছিদ্র নিয়ে তুমুল তর্ক তুলতে পারে—তারই যেন এরা এক একটি টনটনে টাইম-বোম।

আমাদের দেশের গঙ্গার ঘাটে সকালবেলা গান ও ভজনের তাণ্ডব জাগে। এককালে মনে হত, এটা অসভ্যতা। এই স্টীমারে বেড়িয়ে সে ধারণা বদলাতে হল।

মদের দোকানে দারুণ ভিড়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও স্টীমারে প্রচুর। তারা লজেন্স, চকোলেট চিবোচ্ছে। কোনো মোটা ভদ্রলোক স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছেন। কোনো স্ত্রী স্বামীর ঘাড়ে ক্লান্ত মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। এদিকে স্টীমার চলেছে অতন্দ্র। সমুদ্রের উপর কোথাও তার ছেদ নেই, যতি নেই। উত্তাল সমুদ্রও দিকচিহ্নহীন। যেদিকে চাও—শুধু জল আর জল। জলের উপর উড্ডীয়মান সিন্ধু-সারস। উদ্বেল তরঙ্গমালায় আকুলিবিকুলি

করছে অপার নীল-সিন্ধু। চোখে পড়ে দু-একটি বাণিজ্য-জাহাজ। ইংলিশ চ্যানেলের উপর বৈকালিক আলোছায়ার ইন্দ্রজাল। ডেকের উপর হাঁটতে হাঁটতে—ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় টলে পড়তে হয়। প্রপেলারের গম্ভীর গর্জনে কাঁপতে থাকে স্টীমারখানা। কারো সঙ্গে ধাক্কাও লেগে যেতে লাগল। বললাম, সরি······

এই বললেই সাতখুন মাপ।

স্টীমারের রেস্তরাঁয় গিয়ে দেখি, আলফ্রেড খাচ্ছেন। সামনে খাবার। পাশে—বড় গেলাসে বিয়ার।

আলফ্রেড ডাকলেন। হেসে সেলাম ঠুকে চলে এলাম নিজের জায়গার উদ্দেশ্যে।

আমার প্রাক্তন জায়গাটি দখল করে আছেন, দেখলাম—একটি বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা তাঁর দুঃখের কথা বলে যাচ্ছিলেন মিস কটনের কাছে।—

আমরাও ফিরছি দেশ বেড়িয়ে। কী বেড়ানোই যে হল!

কেন, সফল হয়নি?

আরে দূর দূর! ওকে বেড়ানো বলে? শুধু টাকাগুলো জলে গেল! যেমন জুটেছিল আমাদের কোরিয়ার, তেমনি সব সঙ্গী! কোরিয়ার কিচ্ছু বোঝাতে পারেনি। শুধু বনজঙ্গল দেখে ফিরে আসছি।

বৃদ্ধা থামলেন। জিগ্যেস করলেন, তোমাদের কেমন হল?

খুব ভালো। মিস কটন জবাব দিল: আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। আমাদের কোরিয়ারও ছিল লোক ভালো।

তাকে একবার দেখতে পেলে ভালো হত।

বৃদ্ধা প্রার্থনা জানালেন মিস কটনের কাছে।

কটন আমার দিকে চাইল: আলফ্রেডকে দেখেছ নাকি?

সে তো পাব-এ বসে আছে—দেখে এলাম।

তাকে গিয়ে আমার নাম করে একবার বলতে পার যে, আমি ডাকছি?

খুব পারি।

আলফ্রেডকে গিয়ে বললাম সেকথা।

আলফ্রেড তখন খাদ্যপানীয়—সব শেষ করে সিগারেট নিয়ে বসেছেন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে বলো, আমি তাকে ডাকছি।

তাই বললাম।

বৃদ্ধা তখন রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রদর্শন করছিলেন। তাঁর মাথার পাকা চুল প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ছে।

কটন আমার হাতখানাকে চেপে ধরে বসিয়ে দিল আমার পুরাতন জায়গায়। বললে, আর যেতে হবে না। বসো চুপ করে এখানে।

বললাম, বুড়ি কোথায় বসবে?

সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানে গিয়ে বসবে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম, আবার না জানি, কি খেতে হয়!

ঠিক তাই। মিস কটন কলা বার করতে লাগল তার ব্যাগ থেকে। চোখে তার বিদ্যুৎ।

কিন্তু খাবার আগেই আলফ্রেড এসে গেলেন।—কী বলছিলে?

যখন ডাকা হল তখন আসতে বুঝি কষ্ট হচ্ছিল?

মিস কটনের স্বর আদেশসূচক। গম্ভীর।

উড়িয়ে দিলেন আলফ্রেড: আরে, আমার কি মরবার সময় আছে? খানিক পরেই তো ডোভারে পৌঁছচ্ছি। তোমাদের মালপত্রগুলো তো সামলাতে হবে, না কথা শুনে বেড়ালেই চলবে?

ঠিক আছে। কথা শুনে বেড়াতে হবে না।

মিস কটনও রাগ দেখাতে জানে।

আলফ্রেড তা সত্ত্বেও তাগাদা দিলেন : তাড়াতাড়ি বলো।

তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারো।

তাহলে ডাকলে কেন?

যখন ডেকেছিলাম, সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর রাগ করে লাভ নেই। প্রাণ আমার (sweetheart) বলো!

এখন যা বলবার, তোমার গভর্নরকে বলব।

গভর্নরের কথা শুনেই আলফ্রেড ভয় খেয়ে গেলেন।

বললেন, বুকে একটা ব্যথা লেগেছিল, তাই আসতে পারিনি। তা, যেরকম করে তুমি অপমান করছ, গভর্নর জানলে ক্ষমা করবেন।

এতক্ষণে আপস হয়ে গেল।

মিস কটন হেসে একটা কলা দিল আলফ্রেডকে।

ক্ষমা করো।—আলফ্রেড বললেন, এ কলা খেলে আর বুকের ব্যথা নিয়ে স্টীমার থেকে নামতে হবে না। তখন তোমাদের নামাতে পারব না। তোমরাই আমাকে নামাবে।

কলা খেলেন না আলফ্রেড।

ঝুলির কলা আপাতত ঝুলিতেই ফেরৎ গেল।

মিস কটন বৃদ্ধাকে ডেকে আলফ্রেডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

ডোভারে এসে স্টীমার ভিড়ল সন্ধ্যা সাতটায়।

কে বলে, বাঙালি ছেলেমেয়েরা ইংরেজী গান গাইতে পারে না? ইংরেজদের সঙ্গে মিশে তারাও গলা মেলাল। নামবার সময় সে কী উন্মাদ জীবনস্রোত! যেন গোটা ইংলণ্ডটা সকলের বাড়ি। আমরা ফিরে আসছি নিজেদের বাড়িতে। নিজেদের আত্মীয়—নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে।

ডোভার স্টেশনে ঢোকবার মুখেই বাধা। পুলিশ বললে, লাইন দাও।

তা, ইওরোপের লোক লাইন দিতে ওস্তাদ।

ছেলে এবং মেয়ে, যুবক এবং যুবতী, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা—সকলে মিলে এক সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়াল। অনেকের সঙ্গে কুকুর ছিল। কুকুর রইল মালিকের কোলে, নয় তার পাশে। অন্য কারো সঙ্গে কুকুরের সম্পর্ক নেই। সে তার মালিকের ব্যাপারেই সচেষ্ট। অন্যের প্রতি উদাসীন।

একই লাইনে আমি দাঁড়ালাম—ব্রিটিশ শ্রেণীভুক্ত হয়ে। সামনে রইল মিস কটন। পিছনে মিস জোন্‌স্‌। তারা আমার প্রত্যক্ষ প্রহরী।

পাশ দিয়ে মাল চলে যেতে লাগল। ইংরেজ পোর্টাররা ঠেলা-গাড়িতে মাল চাপিয়ে ঢুকতে লাগল স্টেশনে। ব্যবস্থা সুন্দর।

যখন কাস্টামস্‌-এর এলাকায় গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখি মাল থরে থরে সাজানো। একটি সুটকেসেরও গোলমাল হয়নি।

আমাদের দলের মালপত্র চেক হতে আরম্ভ হল।

আলফ্রেড বললেন, জার্মানিতে আমি একটা ক্যামেরা কিনেছি

তাঁর কাছ থেকে নিয়মমতো ডিউটি আদায় করা হল।

মিসেস ক্যানাডিকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কিছু এনেছ ?

একটা ঘড়ি···

বিল লেখা শুরু হয়ে গেল। তিন পাউণ্ড বাড়তি দিতে হল তাকে।

আমার ভয় হচ্ছিল, হয়তো ধরে অনেক কিছু জিগ্যেস করতে পারে। আর জিগ্যেস করলে মিথ্যা কথা বলবার উপায় নেই। ইংরেজরা সব করতে পারে, মিথ্যা কথা বড় একটা বলে না। মিথ্যা কথাকে ঘৃণা করে।

আরো ভয় হচ্ছিল, যদি টাকা চেয়ে বসে। দুটো ঘড়ির উপর ডিউটি তো কম নয়। ছ' পাউণ্ড।

আমার কাছে ছিল তখন মাত্র দু পাউণ্ডের দু'খানি নোট। তাও, নোট দুখানি খরচ করব বাসায় গিয়ে—এমন একটা ইচ্ছে মনে মনে পোষণ করে আছি। যদি বেশি চেয়ে বসে, তখন এই মিস কটনের কাছেই হাত পাততে হবে। তার চেয়ে আর লজ্জার কিছু নেই। মিস কটন স্বেচ্ছায় আমার পিছনে অনেক মনোযোগ খরচ করেছে বলেই কি তার প্রতি এই অত্যাচার করব ? ধার বলে হয়তো নিতে পারি, পরে শুধতেও পারি। মিস কটন তার জন্য প্রস্তুতই মনে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঋণ পরিশোধ করতে পারছি, ততক্ষণ তো আমার প্রতি তার যে কোনো ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সে সুযোগ কেন দেব ? সে সুযোগ কেন নেব ?

সুযোগের আদান-প্রদানের কোনো প্রশ্নই উঠল না।

যখন সময় এল—জিগ্যেস করলাম, আমার মাল তুমি পরীক্ষা করবে ?

কাস্টামস-এর লোক বললে, না, ধন্যবাদ তোমায়।

আমি আমার ব্যাগকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে চলে এলাম।

তাই দেখে তো দলের লোক আনন্দে আটখানা।

বাইরে এসে সকলেই বলাবলি করতে লাগল, ভাগ্যবান তো

অমুক! দু-দুটো ঘড়ি এনেছে, একটা প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হল না। আর ক্যানাডিকে গুনগার দিতে হল!

আলফ্রেড বললেন, ভাগ্যবান কি সাধে? কিরকম শিখিয়েছি? বুক উঁচু করে গিয়ে বললে, আমার মাল তুমি পরীক্ষা করবে? তারা তো দেখেই থ'! আবার কিছু বলবার আছে?

ক্যানাডির জন্য সকলেই দুঃখ করল। আমিও সমবেদনা জানালাম। বললাম, লণ্ডনই তে আমার শেষ নয়। ভারতবর্ষের মাটিতে নামলে কী হবে আমার—কে দেখছে? তবে একটা ঘড়ির জন্যে তোমাকে ছেড়ে দিলে পারত!

মিস কটন বললে, ভারতবর্ষের মাটিতে নেমে আর কী করবে? যেরকম চালাক হয়ে গিয়েছ, এইখানেই থেকে যাও।

মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। বললাম, আমার মা আছেন, তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি এবারকার মতো ফিরব। মা দুঃখিত হলে যে, ইংলণ্ডের সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে!

তাই নাকি? মাকে খুব ভালোবাস বুঝি?

মাকে আমি ভালোবাসি, কি মা আমায় ভালোবাসেন, জানি না।

মিঃ রবার্টসন বললে, তুমি কিছু মনে কোরো না। কটা বাঙালি মেয়েকে কাস্টামস-এর সঙ্গে যেভাবে তর্ক করতে দেখলাম, তাতে তাদের কম্যুনিস্ট না ভেবে পারা যায় না। একটা বড় মুকুট কিনে এনেছে কনটিনেণ্ট থেকে অথচ ডিউটি দিতে রাজী নয়।

মিঃ রবার্টসনকে এতদিন নির্লিপ্ত ও ভালোমানুষ বলেই জানতাম। এ কি কথা শুনছি তার মুখ থেকে? অবশ্য ব্যাপারটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদের স্টীমারের সহযাত্রী দুটি মেয়ে নিদারুণ লড়াই দিয়েছে ব্রিটিশ কাস্টামস-এর সঙ্গে। তাই বলে তারা কংগ্রেসী কি কম্যুনিস্ট, সে বিচারের রায় রবার্টসনের মুখ থেকে শুনতে চাইনি! তাদের গায়ে লেখা আছে—কম্যুনিস্ট? অসহ্য! নিজের জাতভাইয়ের সম্বন্ধে দুটো মন্তব্য করতে আমি পারি। তাই বলে ইংরেজ করবে?

বললাম, তুমি কিছু না মনে করো তো বলি। ওরা যে কম্যুনিস্ট—এমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছ? আর কম্যুনিস্ট হলেই যে তারা নিন্দার পাত্র হবে—এমন কি যুক্তি আছে? লড়াই করতে দেখব বলেই কি তাদের আখ্যা দেব—কম্যুনিস্ট?

মিঃ রবার্টসন অত বিচার করে হয়তো বলেনি। তাই আমতা আমতা করতে লাগল।

কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে। চুপ করে গেলাম।

স্টেশনের গায়েই ব্রডওয়েসের বাস অপেক্ষা করছিল। লণ্ডন থেকে এসেছিল আমাদের নিতে। তাতে চড়ে বসলাম রাত্রি সাড়ে আটটায়।

আলফ্রেড চিৎকার করে উঠলেন, তিন হাজার মাইল ভ্রমণ করে এলাম।

বাস ছুটতে লাগল বিপুল বেগে।

'লেডিস-ওয়াচ যে কিনেছ—কাকে দেবে? তোমার তো বিয়ে হয়নি। কোনো মেয়েবন্ধু আছে নাকি?'

স্টীমারে আসতে মিস কটন প্রশ্ন করেছিল।

উত্তর দিতে পারিনি। অথচ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে কী বলতাম? মেয়েবন্ধু এখানে যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষে ঠিক এ-অর্থের কোনো অন্বয় নেই। বন্ধু বলতে গেলে সেখানে পুরুষকেই বোঝায়। সেখানে একটি ভদ্রলোকের পঞ্চাশটা পুরুষবন্ধু থাকতে পারে, মেয়েবন্ধু কিন্তু একটিই। হয় স্ত্রী, নয় ভাবী-প্রিয়া। ভারতবর্ষে যিনি বলেন, তাঁর পঞ্চাশটা মেয়েবন্ধু আছে, হয় তিনি মিথ্যাবাদী, নয় প্রবঞ্চক। এখানে একটি পুরুষের যেমন পঞ্চাশটি মেয়েবন্ধু থাকা সম্ভব, একটি মেয়েরও তেমনি পঞ্চাশটি ছেলেবন্ধু থাকা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের মাটি কি এ আদর্শের আরাধক?

লীলা আমার মেয়েবন্ধু কিনা, জানি না।—

তবে লেডিস-ওয়াচ যে কিনেছি, নিঃসন্দেহে সে তার জন্যই। তাকে দেব বলেই কেনা।

পিছনে ফেলে-আসা সমস্ত অধ্যায়টাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল।—

কলকাতায় মায়ের খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। ভোরে উঠে তিনি

হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। ঘুম থেকে ওঠবার আগেই দেখতাম, মা ফিরে এসে রান্না চাপিয়েছেন। আমার জন্য চা এনে হাজির করেছেন।

একদিন সকালে উঠে দেখি—বেলা হয়ে গিয়েছে। তখনো মা ফেরেননি। মুখের সামনে চা এগিয়ে দিতে কেউ নেই। কী যেন একটা যোগের দিন ছিল সেটা। না জানি, পুণ্যার্থীদের কী ভীষণ ভিড় গঙ্গার ঘাটে। রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়তে হল। মায়ের বয়স হয়েছে। গতকাল গিয়েছে একাদশী। একাদশীতে মা নিরম্বু উপবাস করেন। তারপর কলকাতার পথ-ঘাট……

বেলা তখন সাড়ে আটটা হবে। সহসা একটা বড় মোটর এসে হাজির দরজার সামনে। ব্যগ্র ব্যাকুল চিত্তে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালাম। সে-মোটরে মা ছিলেন, আর একজন গিন্নীবান্নীর মতো একটি দশাসই মহিলা, আর একটি—কী বলব? অপরূপ স্বাস্থ্যবতী তরুণী।

তরুণীটি একেবারে অচেনা নয়। ইতিপূর্বে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাও কোথায়—? স্নেইথ্ সায়েবের বাংলোর কাছে। দীঘা দেখতে গিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে। গিয়েছিলাম নয়। বন্ধুরা জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আশেপাশে পাইন বন। বনের মধ্যে কতরকমের পাখি। প্রায় দুশো গজ চওড়া সী-বীচ মাইলের পর মাইল ধরে চলেছে। তার সঙ্গে বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ি কোথাও কোথাও ঝোপঝাপে পরিপূর্ণ। কোথাও আবার তৃণাচ্ছাদিত। উচ্চাবচ টিলার নিচে কেয়াবন। সামনে বীচিমালা-পরিশোভিত বঙ্গোপসাগর। সূর্যালোকে তার অগাধ জলরাশি জুড়ে বিচ্ছুরিত তরল-অনল।

তরুণীর সঙ্গে আরো কয়েকটি কলেজে-পড়া মেয়ে ছিল।

আমার সঙ্গীদের ভিতর কে যেন একটি কদাকার মেয়েকে উপলক্ষ করে কথা ছুঁড়ে দিয়েছিল : বাবাঃ!

মেয়েটি এসে সহসা আমাকে ধরেছিল।—বাবা নয়, বলুন মা।

আমি হতভম্ব!

তরুণী অগ্রণী হয়ে মিটমাট করে দিয়েছিল। তার সঙ্গিনীকে বলেছিল, ওঁকে ধরলে কেন? উনি তো বলেননি। তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

মেয়েটি ক্ষমা চেয়েছিল।

সন্ধ্যায় সদলে সমুদ্র-সৈকতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। চাঁদনি রাত।

ইতস্তত ঘুরতে-ঘুরতে সহসা কী একটা জিনিসে যেন নজর পড়ে যায়। জিনিসটা চিকচিক করছে বালির উপর। হাতে তুলে দেখি, একটা জড়োয়া দুল। ইতিপূর্বে তরুণীসহ মেয়েগুলি ঐ স্থান কয়েকবার অতিক্রম করেছিল।

ঐ তরুণীটিকেই গিয়ে বলেছিলাম, মাপ করবেন। এইটে কুড়িয়ে পেয়েছি এইমাত্র। আপনাদের কারো হতে পারে কি?

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়েছিল ঐ তরুণী আমার দিকে। বলেছিল: উঃ, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, জানি না। এটা আমারই। হারিয়ে ইস্তক জানেন, কী ভীষণ মন খারাপ করে ঘুরছি? যদি সন্দেহ হয়, আমার একটা কান আপনি দেখতে পারেন।

দুলটা তার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, অত সহজে সন্দেহ করি না আমি মানুষকে। বিশেষ করে আপনার মতো মেয়েকে।

কেন, আমি কী?—তরুণী ফিক করে হেসেছিল। হেসে প্রশ্ন করেছিল।

জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম।

তরুণী এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। এলো চুল তার—সমুদ্র-হাওয়ায় উড়ছে।

—উত্তর দিলেন না যে বড়?

কী উত্তর দেব?

আমার কথার ?

অস্ফুট স্বরে হয়তো বলেছিলাম, আপনি খুব ভালো মেয়ে।

তারপর আর দাঁড়াইনি। তরুণীকে এড়িয়ে চলে এসেছিলাম। চোরাচাউনিতে অবশ্য দেখেছিলাম, তরুণী তখনো তাকিয়ে আছে আমার গমনপথের দিকে।···

দলের মুখ থেকে পরে জানতে পেরেছিলাম—তরুণীর নাম লীলা।

মোটর থেকে নেমে লীলা যেন আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন কি, নমস্কার করতে পর্যন্ত ভুলে গেল।—এ কি, আপনি এখানে ?

আমি যে এ বাড়িতে থাকি।

দেখুন তো, ইনি আপনার কেউ হন কিনা !

লীলা আমার মায়ের দিকে আঙুল দেখাল।

বললাম, মা।

ইনি গঙ্গার ঘাটের ভিড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

সে কি !

হ্যাঁ, ব্যস্ত হবেন্ না। এখন ইনি ভালো আছেন।

লীলা ধরে ধরে আমার মাকে নামাতে গিয়েছিল মোটর থেকে। ধরতে কিন্তু হয়নি ; মা নিজে থেকেই নেমে পড়েছিলেন।

লীলাকে কত ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, জানি না। পাশের ঐ দশাসই মহিলাটিই লীলার মা শুনেছিলাম। তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। প্রণাম করে মা ও মেয়ে—উভয়কেই বলেছিলাম, একবার ঘরে এসে পায়ের ধুলো দিন।

আমার মা-ও তাই বলেছিলেন।

লীলার মা বলেছিলেন, লীলা বরং থাকুক। দেখাশোনা করুক। খানিক পরে গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যাবে। কর্তা অফিসে বেরোবেন। আমি না থাকলে চলবে না। আমি এখন যাই।

লীলাদের বাড়ির গাড়ি।

গাড়ি এসে লীলাকে পরে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন অবশ্য না খেয়ে একটু বেলায় অফিসে গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি, লীলা বসে আছে আমার ঘরে।

লীলা বলেছিল, তৈরি হয়ে নিন। আমাদের বাড়ি আজ আপনার নেমন্তন্ন।

সে কি! কোথায় আমি করব আপনাকে নেমন্তন্ন, না আপনি?

আপনার নেমন্তন্ন মানে তো ঐ বুড়ি মাকে ঘানিতে জোতা! তার চেয়ে আমাদের বাড়ির নেমন্তন্ন অনেক সুশ্রী।

তবে থাক। আর দয়ায় প্রয়োজন নেই। একদিন খেয়ে আমার দুঃখ ঘুচবে না।

সত্যি, আপনার মতো ছেলেরা বিয়ে করে না কেন বলুন দেখি? —লীলা ভ্রূকুটি করেছিল।

সত্যি, আপনার মতো মেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় না কেন বলুন তো জগতে?—আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

লীলা জবাব দেয়নি।

মা পঞ্চমুখে লীলার সুখ্যাতি করেছিলেন।—এমন মেয়ে আর দেখা যায় না। মা যেন দুর্গাপ্রতিমা। যার ঘরে যাবে—আলো করে দেবে।

লীলা মায়ের মুখ চেপে ধরতে গিয়েছিল।

এক রাত্রের ভিতর একটি মেয়ে যে কাউকে এমন আপন করে নিতে পারে, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

লীলাদের বাড়ির গাড়ি চেপে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরেছিলাম রাত এগারোটায়। লীলাদের বাড়ি বউবাজারে। আমাদের বাড়ি তালতলায়। বাড়ি নয়—বাসা। লীলার মায়ের সে কি উত্তপ্ত যত্ন! হারানো দুল আমার হাত থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে কি আশীর্বাদ!

লীলার বাবা শুনলাম বিখ্যাত এটর্নি। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু দেখা হয়েছিল লীলার দাদার সঙ্গে। দাদার নাম অরুণ। এবার ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করেছে। আর কী ভদ্র, অমায়িক তার ব্যবহার। সেই-ই গাড়ি ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে।

পরদিন থেকে এক নূতন উপসর্গ এসে দেখা দিয়েছিল।

রাত নটা বাজলেই টিফিন কেরিয়ারে করে আমার ভাত-ডাল-তরকারি-মাংস আসত। বলব কি, খেতে যেমন সঙ্কোচ হত, ফিরিয়ে দিতেও তেমনি সাহস হত না।

এক ছুটির দিনে বসে বসে লিখছি। লীলা এসে হাজির।

কী করছেন ?

প্রেমের গল্প লিখছি।

প্রেম সম্বন্ধে আপনি কি বোঝেন যে, অনর্থক সময় নষ্ট করছেন ?

সময় এমনিতে নষ্ট হবে, অমনিতেও···। তার চেয়ে প্রেমের গল্প লিখে মরা ভালো।

এই বয়সে যদি মরার সাধ হয়ে থাকে, আর কিছু বলবার নেই। তবে জেনে রেখে দিন, যে মেয়েকে নিয়ে প্রেমের গল্প ফেঁদেছেন, সে ভুলেও আপনার ঐ গল্প পড়বে না। পড়বে তাঁদেরই লেখা, যাঁদের ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ঐ কর্মে দক্ষ হতে চলেছে।

শুনলাম। তারপর ?

লীলা হাতঘড়ি দেখল।—এখন বেলা এগারোটা। চলুন, ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি। গাড়ি এনেছি।

আপনাদের কটা গাড়ি ?

তা গোটা তিনেক।—লীলা উত্তর দিয়েছিল।

তা না হয় যাচ্ছি। তার আগে বোঝাপড়া হয়ে যাক।

কিসের বোঝাপড়া ?

রোজ রাত্রে এই খাবার পাঠাবার অর্থ কি ?

লীলা চোখ বুজেছিল। চোখ বুজে বিজ্ঞের ভাব করে বলেছিল : আমি এ সম্বন্ধে মশাই কিছুই বলতে পারি না। আমি খাবার পাঠাই না।

ভালো কথা। মায়ের মুখে শুনেছি, আপনি অনেক দিন দুপুরবেলা এসে আমার বই-টইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যান। এ সম্বন্ধেও আপনি কিছু বলতে পারেন কিনা ?

পারি। আমার মা আপনার মায়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছেন। এসব হচ্ছে সেই সই পাতানোকে সেলিব্রেট করা। যদি আপনার অসুস্থ মায়ের কিছু শ্রম লাঘব করা যায়···

অসুস্থ মা পৃথিবীতে একা আমার নেই ; আরো অনেকেরই আছে।

আছে। তাদের ছেলেরা আপনার মতো বোকা নয় !

বটে ! তা চালাক হতে গেলে কী করতে হবে শুনি ?

অবিলম্বে একটি বিয়ে করতে হবে।

বেশ। যদি বলি, তোমায় আমি বিয়ে করলাম।

অবলীলাক্রমে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে।

'তুমি' শুনে লীলা রাগেনি। বরং হেসেছিল। হেসে বলেছিল, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ! বিয়ে অমনি যাকে-তাকে করব বললেই হল ? সে যদি তোমায় বিয়ে না করে ?

তা বটে ! লজ্জিত হয়েছিলাম।—আমার তো তিনখানা মোটর নেই।

তা ছাড়া তোমার ঘরও নেই।—লীলা যোগ করেছিল কথাটা। চাপা হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

সহসা সংবিৎ ফিরে পেয়েছিলাম। ক্ষমা চেয়েছিলাম লীলার কাছে।

লীলা হাত ধরে টেনেছিল।—আপনি-আজ্ঞে বলে আর ক্ষমা

চাইতে হবে না। সমস্ত রাস্তাটাই তো পড়ে আছে অভিশাপ আর ক্ষমা বর্ষণের জন্যে। তা ছাড়া বিয়ে করতে চাইলেই তো আর দিনের বেলা বিয়ের ব্যবস্থা নেই সমাজে! ওঠ মশাই, আর রাগ করতে হবে না।

একটু থেমে ফের সে বলেছিল, বাবা, বাবা! কী ছেলের পাল্লাতেই যে পড়েছি! কখনো গঙ্গাস্নানে যাই না। একটা দিন মাত্র গিয়েছিলাম, তা—মা গঙ্গার মনে এই ছিল?

ডায়মণ্ডহারবার দেখে ফেরার পথে লীলা বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। নামাবার সময় চুপিচুপি বলেছিল, আমার কোনো দোষ নেই। আমি দিতে চেয়েছিলাম। তুমি নিতে পারোনি।

শুনে কান দুটো লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়।

মনে রেখো, লীলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আজ তুমি কী বলেছ।

কী বলেছি?

বাঃ, এই নাকি তোমার স্মরণশক্তি? আর একজনকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

না হয় দিলে।

'যদি বলি, তোমায় আমি বিয়ে করলাম'।

বলেছি।

এই তো বীরের মতো কথা। এখন তার কী ব্যবস্থা করবে— ভেবে রেখো। এটর্নির মেয়েকে কথা দিলেই হয় না। তার পিছনে শক্তিরও প্রয়োজন। আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি জানাই। কেমন?

আমাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই লীলা সোফারকে গাড়ি ঘোরাতে বলেছিল।

সোফার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

এক পক্ষ কালও কাটেনি।

একদিন সন্ধ্যায় লীলা এসে হাজির।—কী ভাবলে?

কিসের?

আমাকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

বিয়ের কথা বলছ?

আমি কিছুই বলছি না। তোমার আক্কেলটা শুধ্ দেখছি।

আমার আক্কেল খুব তীক্ষ্ণ। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে মায়ের হাতের তৈরি এক কাপ চা খেয়ে নিতে পার। এ মাসে বিয়ের তারিখ নেই।

বিয়ের তারিখ নেই, কিন্তু বেড়াতে যাবার তারিখ আছে কিনা?

জ্যোতিষী আমার পেশা নয়। পঞ্জিকা দেখতে হয় তাহলে।

ঠিক আছে। আমার উপর সে-ভার ছেড়ে দাও। তোমায় শুধু এক কাজ করতে হবে।

হুকুম করো।

রানীখেত যেতে হবে আমার সঙ্গে।

সে আবার কোথায়?

তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। শুধ্ চোখ দুটি বেঁধে আমার হাতটি ধরে চলে যাবে। নৈনিতালের নাম শুনেছ?

সেখান থেকে তো আলু আসে।

নৈনিতালের কাছেই রানীখেত। আমার এক মাসিমার বাংলোয় গিয়ে উঠব। দিন পনেরোর মধ্যেই যাত্রা করতে হবে। মনে থাকে যেন।

অফিসের কি হবে?

এম সি দিয়ে ডুব দেবে।

আর বাড়ির? মানে আমার মায়ের? মাকে কে দেখবে?

তোমার মা তো এখন তোমার একার নন। আমার মায়েরও সই। তাঁর জন্যেও একটা ব্যবস্থা হয়েছে বৈকি! দাদা এসে তাঁর খোঁজ নেবেন। নয়তো, তিনি থাকবেন আমাদের বাড়িতে।

উত্তম ব্যবস্থা। শুনে বাস্তবিকই লোভ হচ্ছে তোমার সঙ্গে রানীখেত যেতে। কিন্তু আমারও একটি বক্তব্য আছে।

বলতে পারো।

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিলেত যাত্রা করছি। পাসপোর্ট রেডি। সব ব্যবস্থা পাকা। এর পর অফিসে ডুব দেওয়া চলে না।

সত্যি ? সত্যি বিলেতযাত্রা করছ ?

লীলা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেকথা শুনে।

পরদিন আবার আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল লীলাদের বাড়ি।

এতদিন লীলার বাবাকে দেখিনি। নিজে থেকে তিনি দেখাও দেননি। সেদিন দেখলাম, স্বয়ং লীলার বাবার সঙ্গে আমার ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। মাটিতে নয়। টেবিলে। বোধ হয় আমার বিলেত-যাত্রার সংবাদেই এই স্বাতন্ত্র্য। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া। আমাকে জাতে উঠতে দেখায় তাঁর এই অভিজাত অভিনন্দন।

লীলার বাবা জিগ্যেস করেছিলেন, কী জন্যে ইউ-কে যাচ্ছি, কবে যাচ্ছি। আমিও তার যথাযথ জবাব দিয়েছিলাম।

চলে আসবার কালে লীলা অবশ্য অভয় দিয়ে চুপিচুপি বলেছিল, আর ভয় নেই। এটর্নির মেয়ে তোমার ভাগ্যে বাঁধা। রানীখেত গেলেও যা তোমার হত না, একবার বিলেত ঘুরে এলে তাই হবে। আগে জানাওনি কেন তোমার এ পরিকল্পনার কথা ? তাহলে তো বাবা কোন্‌কালে তোমাকে বগলে বেঁধে নাচতেন !

উত্তর দিয়েছিলাম, কেউ বগলে বেঁধে নাচুন, হয়তো এ-ইচ্ছে ছিল না মনে।

একটু থেমে ফের বলেছিলাম, আমার প্রার্থনা কিন্তু এখনো মঞ্জুর হয়নি।

সম্ভবপর হলে নিশ্চয় হবে। কী প্রার্থনা বলো······

আমার মায়ের ব্যাপারে যে ব্যবস্থার কথা বলেছিলে, আমার অসাক্ষাতে সেটি যেন বহাল থাকে।

সে তো থাকবেই। সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

তাহলে তুমি রানীখেতের কি করবে?

যে খেতে আছি, আপাতত সেখানে তো হাল দিই। তোমাকে ট্রেনে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারি কেমন করে?

ট্রেনে ওঠবার সময়টাও ঘনিয়ে এসেছিল।……

তার দুদিন আগে লীলা এসেছিল বাসায়। হাতে একখানা খাম। চলে যাবার সময় সে সেটা দিয়ে বলেছিল, এটা রাখো। এটা তোমার পাথেয়।

কী আছে এতে?

খাম খুলে দেখেছিলাম, একশো টাকার কুড়িখানা নোট।

এ কি! এ নিয়ে কি করব?

বাবা তোমায় দিয়েছেন।

বাবা দিয়েছেন, না তুমি দিচ্ছ?

ধরে নাও এ তোমারই টাকা—আমায় হাতে করে দিতে হচ্ছে।

অশেষ ধন্যবাদ। টাকা আমার লাগবে না। তুমি এটা ফিরিয়ে নাও।

একথা বললে খুবই দুঃখ পাব। আমি কি তোমার পর যে, আমার টাকা তুমি নেবে না? ফিরিয়ে দেবে?

ফিরিয়ে দিচ্ছি না। তোমারই কাছে গচ্ছিত রাখছি। দরকার পড়লে চেয়ে পাঠাব। তোমার এই কল্যাণী রূপটি চিরকাল মনে থাকবে।

চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কথায় ভোলাতে চেয়ো না।—লীলা বলেছিল, তুমি যদি কিছুই না নিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে, কী স্মৃতি নিয়ে বাঁচব?

শুধু নিয়ে যাবারই প্রশ্ন, দেবার প্রশ্ন কিছু নেই?

দিয়ে তো গেলে তোমার মাকে। এবার কিছু নিয়ে যাও।

কী নেব? কী তুমি দিতে পারো?

সেটা তুমিই বিবেচনা করে বলো।

তোমার আঙুলের বরং আংটিটা আমায় দাও।—উত্তরে বলেছিলাম : যদি তোমার অসুবিধা না হয়।

লীলার আংটি আমার আঙুলে পরে নিয়েছিলাম। আংটির পাথরটা ছিল ভারী সুন্দর।

বম্বে মেল ছাড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অরুণ আর লীলা ছিল প্ল্যাটফর্মে। মা সজল চক্ষে বিদায় দিয়েছিলেন বাসা থেকে। স্টেশনে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কপালে পরিয়ে দিয়েছিলেন দইয়ের টিপ। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। ভরা ঘট পেতে রেখেছিলেন নমস্কার করে বেরোবার জন্য। গরিব মায়ের পক্ষে যা কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্ভব, তিনি তার কোনোটারই ত্রুটি রাখেননি। বারবার করে বলে দিয়েছিলেন—পৌঁছে যেন চিঠি দিই। মাথা পেতে তাঁর আশীর্বাদও নিয়েছিলাম। জানি না, মানুষ মায়ের এই আশীর্বাদ শেষ পর্যন্ত কতখানি কার্যকরী হয়। কার্যকরী হবে। সব মা-ই তো জগতে ছেলেকে আশীর্বাদ করে বিদায় দেন। তবে কেন নিদারুণ বিমান-দুর্ঘটনায় দগ্ধ হতে হতে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল পুত্র? তবে কেন ট্রেন-সংঘর্ষে মারা যায় সদ্য-বিবাহিতা সুলক্ষণা রমণীর অনিন্দ্যকান্তি কণ্ঠহার? তবে কেন জাহাজডুবির করুণ আর্তনাদে মুখর হয়ে ওঠে মহাসমুদ্রের আকুল তরঙ্গমালা? এর উত্তর সেদিন খুঁজে পাইনি। আজো পাই না।

লীলাও অনুরোধ জানিয়েছিল—তাকে যেন চিঠি দিতে না ভুলি।

অরুণ আশ্বাস দিয়েছিল, মায়ের জন্যে কিছু ভাববেন না। আমরা আছি। আমরা দেখব। আমরা আপনাকে চিঠি দেব।

ট্রেন যখন ছেড়ে দিয়েছে, তখনো দেখেছিলাম লীলা সজল-চোখে রুমাল নাড়ছে। রুমাল নাড়তে নাড়তে তার মাথাটা যেন

হেলে পড়েছিল। আর মুখ ঢেকে ফেলেছিল সে—রুমালে নয়, আঁচলে।

দূর থেকে এর বেশি আর দৃষ্টি চলেনি।

লক্ষ্য পড়েছিল হঠাৎ আঙুলের আংটিটার দিকে। লীলা সঙ্গে আসেনি। তার আংটিটা এসেছিল আমার সঙ্গে। আমার আঙুলকে আলো করে।···

বাস ছুটতে লাগল বিপুল বেগে।

ইংলণ্ডের পথ-ঘাটও কম সুন্দর নয়। অগণিত গির্জা। এত পার্ক—গুনে শেষ করা যায় না। পার্কগুলিতে ঘাসের জাজিম বিছানো। গাছপালার সৌন্দর্যও অপরিসীম। কত গাছ: অ্যাশ, এম, ওক, স্কটস পাইন, লাইম, পপলার, বীচ, চেস্টনাট, মালবেরি, টাইবার্ন, উইপিং উইলো…

পথ কোথাও উঁচু, কোথাও গোড়েন। রাস্তার চারধারে আলো জ্বলছে। কোনো কোনো অঞ্চল একেবারে নিস্তব্ধ। কোনো রাস্তার ফুটপথে হয়তো একটি যুবক, পাশে যুবতী। পরস্পরের প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিমাটি সুষ্ঠু কিনা—নীতিবাগীশ সমালোচকের সেটা বিচার্য। তবে বিলেতের হাইড পার্ক বিদেশীর চোখে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

একাধিকবার দেখা সেই সব দোকান, ব্যাঙ্ক, বাড়ি, লাল বাস দেখতে দেখতে এগিয়ে আসতে লাগলাম।

আলফ্রেড শেষবারের মতো বার করলেন তাঁর সেই মাউথ-অর্গানটি। বাজাতে লাগলেন। কিন্তু তার সুর যেন আজ—এই মুহূর্তে বড় করুণ শোনাতে লাগল।

মাউথ-অর্গানটি রেখে আবার হাসি-ঠাট্টা শুরু করলেন।

মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতে লাগলেন: এবার দু-হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে…এবার দু-হাজার ফুট উঁচুতে…এবার ম্যুনিক-এ আসছি…ব্যাভেরিয়ার রাজধানী ম্যুনিক।

সেইসব পুরাতন স্মৃতিকে নূতন করে ঝালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস।…

কিন্তু এ হাসি-ঠাট্টা যেন করুণ রসেরই পূর্বাভাস। বিদায়-ব্যথার নামান্তর। বিজয়ার মুহূর্তে বোধনের পুনরাবৃত্তি।

শেষবারের মতো একটা হোটেলে এসে ঢোকা হল।

সকলে মিলে এক সঙ্গে—এক টেবিলে বসে চা, বিয়ার খাওয়া হল। মনে হল, যেন কতদিন পরে আবার চা খাচ্ছি। ইংলণ্ডে চায়ের কাপ তুলনামূলকভাবে সস্তা। আড়াই পেনি কি তিন পেনির মতো। চা-ও ভালো। যে দাম দিতে হয়েছে ইংলণ্ডের বাইরে এক কাপ চায়ের জন্য, সেকথা স্মরণ করে প্রাণ ভরে বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষই চা খেল।

তারপর আলফ্রেডের হাতে তুলে দেওয়া হল একটা নোটের তাড়া। আমাদের শ্রদ্ধার, কৃতজ্ঞতার, বন্ধুত্বের অর্ঘ্য হিসাবে।

আলফ্রেড তো কেঁদেই ফেললেন।—তোমাদের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

বেথেল, মিচেল বললে, তোমার কথাও আমরা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করব।

রাত প্রায় পৌনে বারোটার সময় আমাদের বাস এসে দাঁড়াল লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশনে।

বিদায়ের শেষ মুহূর্তের কথা কোনোদিন ভুলব না।

এ যেন দুর্যোগের রাত্রে পরস্পরকে ত্যাগ করা। যেন একটা সুন্দর, স্নেহময় সংসার স্থাপন করেছিলাম, একটা মায়ানীড় রচনা করে আমরা এতদিন সেখানে শান্তিতে বাস করছিলাম। আজ ছেড়ে যেতে হচ্ছে পরস্পরকে—একটা দুর্দৈব অবস্থায়। একটা অবচেতন প্রতিকূলতায়।

সে কী করুণ আকুলি-বিকুলি! সে কী করমর্দনের গভীর নিবিড়তা! সে কী শুভরাত্রি জানাবার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর!

আলফ্রেড বললেন, আমার ঠিকানা তো তোমাদের দিয়েছি। আমি এখন এখানেই কদিন থাকব। যে কোনোদিন সন্ধ্যার পর গেলেই দেখা হবে। তোমরা গেলে আমি খুব খুশি হব।

মিস কটন বললে আমাকে, চিঠি দিও।

মিসেস ক্যানাডি বললে, বড়দিনের সময় কার্ড পাঠাব।

পিটার বললে, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করব।

রাত বারোটায় টিউব ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়।

হাতে সময় বেশি ছিল না। তাই ছুটতে ছুটতে ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ রেলওয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলাম। ওরই এক পাশে পাতালপুরীর টিউব ট্রেন।

বেথেল আর পিটার—শেষ পর্যন্ত নয়, খানিকক্ষণের জন্য ট্রেনে সঙ্গ দিল।

বেকার স্ট্রীটে এসে বদল করলাম গাড়ি।

রাত সাড়ে বারোটায় নিজের ঘরে এসে পৌঁছলাম।

সব নিস্তব্ধ। ঘর অন্ধকার। আলো নিবিয়ে শচীনদা ঘুমোচ্ছেন। জানালার শার্সির উপর কালো পর্দা টানা। শচীনদার কাছে এখন অনেক রাত।

আমার টেবিলের আলোটা জ্বেলে নিলাম।

দেখি, শূন্য টেবিলে দুখানা চিঠি। একখানা লীলার। অপরটি অরুণের।

লীলার চিঠি যে আসবেই—এ যেন মন বারেবারে বলছিল। আমিও তাকে দুখানা চিঠি দিয়েছি কনটিনেণ্ট থেকে। আর কী আনন্দ যে হল এত রাতে লীলার চিঠিখানা পেয়ে···

জামা-জুতো ছাড়া দূরে গেল, লীলার চিঠিখানা আগে হাতে তুলে নিলাম।—

লীলা লিখেছে :

শেষ পর্যন্ত সেই রানীখেতেই এলাম। বি. এ. পরীক্ষা এবার দেওয়া হল না। কলকাতা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতার জীবনের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে করে পরাজিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি-হীন সেই শূন্য দিনগুলিকে পূর্ণ করব কেমন করে? তাই দাদাকে নিয়ে চলে এলাম। আপাতদৃষ্টিতে রানীখেত

মন্দ নয়। দিল্লী ঘুরে এখানে আসতে গিয়ে পথে পড়েছে বেরিলি স্টেশন। যাত্রীশালায় রাত কাটিয়েছি। ট্রেন ধরে এসেছি কাঠ-গুদামে। কাঠগুদাম থেকে বাসে চড়ে রানীখেত। কুমায়ুন পাহাড়ের ছ হাজার ফুট উঁচুতে এই শৈলতীর্থ। দেরাদুন, মুসৌরীর চেয়েও এ স্থান বিস্তৃত। পাহাড় কেটে কেটে সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে পথ। রাস্তার ভাওয়ালীতে একটা চমৎকার স্যানাটোরিয়াম-বিল্ডিং। পাহাড়ের গা বয়ে বাস উঠতে থাকে। একদিকে কাঠগুদাম, আর একদিকে নৈনিতাল। উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলার এই রানীখেত পাহাড়ী পথের সাহায্যে দুদিকের যোগাযোগ রক্ষায় তৎপর। আর রাস্তাগুলিও কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুপাশে দেওদার, পাইন আর সাইপ্রাসের ছায়াচ্ছন্ন মিছিল। তুষারমৌলী হিমালয়ের সে কী অপূর্ব সূর্যস্নান! রৌদ্রছায়ার খেলায় তার গায়ে কত বিচিত্র রঙের সমাবেশ! কখনো গাঢ় সবুজ, কখনো হরিৎ বর্ণ, কখনো সোনালী। চোখে পড়া আশ্চর্য নয় তার বাইশটি শৃঙ্গ।—নন্দাদেবী, বদ্রীনাথ, ক্যামেট, ত্রিশূল, নন্দাকোট, পাঞ্চৌলী, নীলকান্ত, তিলকোট ইত্যাদি ইত্যাদি। মাসিমার বাংলো থেকে কিছুদূরে গেলেই বড় পোস্ট অফিস। কোনোসা কনভেন্ট, আরো এগিয়ে গল্‌ফ কোর্স। গ্লোব আর নভেলটি সিনেমা হল। রোটারি ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্লাব ছাড়িয়েও কখনো কখনো হেঁটেছি। কার্ট রোড থেকে ফেরবার পথে চোখে পড়ে বড় বড় হোটেল—রোজা মেরি, ওয়েস্ট ভিউ। আচমকা যেন মনে হয়, কোনো সায়েবের সঙ্গে বেরিয়ে আসছ তুমি কোনো হোটেল থেকে। কলকাতায় যখন ছিলে, তুমি ছিলে সীমিত হয়ে। আজ সারা ভারতবর্ষে কোথাও তুমি নেই। অথচ স্থলে-জলে যেন তোমারই প্রতিচ্ছবি প্রসারিত হয়ে উঠেছে। কী ভীষণ আমার চোখ খারাপ করে দিয়ে চলে গেছ তুমি!

একদিন কী ক্ষণেই যে তোমাকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গিয়েছিলাম! সেদিনের স্মৃতি তোমার মনে পড়ে কিনা জানি না।

তোমাকে নিয়ে গঙ্গার কূলে কূলে ঘোরবার সময়—হয়তো তুমি লক্ষ্য করোনি, একটা পাখির গায়ে ঢিল ছুঁড়েছিলাম। পাখিটা মেয়ে ছিল। গাছের ডালে অপেক্ষমান তার দয়িতের কাছে যাবার জন্য সে ব্যস্ত হয়েছিল। এই অবস্থায়—আজ মনে হয়—তাকে বাধা দেওয়া ঠিক হয়নি। তার অভিশাপ অলক্ষ্যে এসে আমাকে বিদ্ধ করছে। মনে হচ্ছে, আমারই প্রিয়তম বুঝি কোনো উচ্চ গাছের ডালে বসে আছে। যাবার চেষ্টা করেও আমি তার কাছে যেতে পারছি না। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়েছে অদৃষ্টের ঢিল।

তোমার মা সম্প্রতি আমাদের কলকাতার বাড়িতে এসে আছেন। তিনি প্রথমে আসতে রাজী হননি। কিন্তু তিনি না এলে আমরা বাইরে যেতে পারি না—এটা বোঝাবার পর তবেই তিনি এসেছেন। তোমার চিন্তায় তিনি খুব কাতর। আমরা যতদূর সম্ভব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি। দাদা সপ্তাহখানেক পরেই কলকাতায় ফিরবেন।

বাবার ইচ্ছা, বেশ কিছুদিন ইংলণ্ডে থেকে তুমি যেন একটা কিছু নিয়ে আস। অর্থাৎ নেমপ্লেটে লটকাবার মতো এমনি এক মারণাস্ত্র। আমার ইচ্ছা কিন্তু বিপরীত। কী হবে নেমপ্লেট পল্লবিত করে? জীবনের পক্ষে সেইটেই তো একমাত্র সুখের প্রতিশ্রুতি নয়। তোমাকে কাছে না পেলে আর একটা দিনও আমার মিষ্টি বলে মনে হচ্ছে না। কবে ফিরছ—শীঘ্র ফিরছ কিনা, অবশ্যই জানাবে। ন্যুর্নবার্গ থেকে যে চিঠিটা লিখেছিলে—পেয়েছি। তার মধ্যে তো কিছুই লেখনি! আর কোনো চিঠি পাইনি।

কনটিনেণ্ট কেমন লাগল, কোথায় কি দেখলে, বিস্তারিতভাবে সব জানাবে। একটা হাসির কথা শুনেছ? এত তো বিরহিণী হয়ে রয়েছি, অথচ লোকে বলছে, আমি নাকি খুব মোটা হয়ে যাচ্ছি। আমিও সেটা অনুভব করছি। অনেকগুলি কর্‌সেট ফেটে গেছে। অনেকগুলি নূতন তৈরি করে পরছি। মাসি বলছেন, আর নাকি

আমাকে ঘরে রাখা যায় না। ঘরে না রাখা গেলে বরের মুখে তো রাখা যায়! হ্যাঁগো বর, তুমি কী বলো?

মেসোমশাই লোকটিও মন্দ নয়। রিটায়ার্ড আই. সি. এস.। আমাকে যতদূর পারেন, আনন্দে রাখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর সঙ্গে সময় সময় টেনিস আর বিলিয়ার্ড খেলি। আমাকে একটা বেবি-অস্টিন দিয়েছেন। সেটা চালিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে আসি। কিন্তু যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণই একটু অন্যমনস্ক থাকা। তারপরেই অসহ্য অস্বস্তি! রাত এলে···? সেকথা আর বলব না। তুমি যদি সত্যিকার কবি হও, সহজেই কল্পনা করে নিতে পারবে এই অবস্থা।

একটা অস্থির মনের উদগ্র পরিচয়ে লীলার সমস্ত চিঠিখানা উদ্দাম। আর কী সরল নির্ভরতা! আমি যে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়তে পারি, এতদিনে আমার মনের যে পরিবর্তন আসতে পারে—এ সন্দেহ বিন্দুমাত্র জাগেনি তার লেখায়। দেবতার কাছে ভক্তের যে আত্মসমর্পণ, প্রেমের বেদীমূলে লীলারও সেই একনিষ্ঠতার স্বীকৃতি!

খুব ভালো লাগল তার এই চিঠিখানা। এখনি উত্তর লিখতে পারলে ভালো হত। টাটকা টাটকা উত্তর দিতে পারায় যে উত্তেজনা, বিলম্বে তা স্তিমিত। কিন্তু রাত হয়েছে। আরো একখানা চিঠি পড়া বাকী।

আশায়-আনন্দে এবার অরুণের চিঠিখানা তুলে নিলাম টেবিল থেকে।

পড়তে লাগলাম। কিন্তু এ কি! এ কি! হাত কাঁপছে না? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? চোখের দৃষ্টি এমন ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে নাকি? কী পড়ছি···কী দেখছি? এ কি সত্যি? এ কি সম্ভব? আমার অদৃষ্টে এ চিঠি পড়বারও ধিক্কার ছিল? কী সাংঘাতিক···কী ভয়ঙ্কর···কী হৃদয়-বিদারক সংবাদ···

অরুণ লিখছে :

রানীখেতের বাংলো থেকে দু মাইল দূরে মাসিমা-মেসোমশাই তাঁদের এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাংলোয় লীলা ছিল একা। আপনাকে চিঠি লিখছিল। আমিও বাসায় ছিলাম না। সন্ধ্যার শো-তে সিনেমায় গিয়েছিলাম। লীলাকে মাসিমা নাকি ফোন করেন। তাঁর কাছে যেতে বলেন। লীলা একাই গাড়ি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। চাকরের জিম্মায় বাড়ি রেখে যায়। কিন্তু এখানের আকাশ সব সময়েই বর্ষণোন্মুখ : কখন বৃষ্টি হবে আর কখন হবে না, বলা শক্ত। এই মুহূর্তে দেখা গেল প্রসন্ন সূর্য, পরমুহূর্তেই শিলাবৃষ্টি। পথে বেরিয়ে এমনি এক শিলাবৃষ্টির মধ্যে লীলাকে পড়তে হয়। রাতে লীলা ফেরে না। মাসিমা ফিরে এসে জানান, লীলাকে তিনি ফোন করেননি। তারপর সমস্ত দিন কেটে যায়। দিনেও লীলা ফেরে না। শূন্য মোটরটা বিকল অবস্থায় এক জায়গায় পাওয়া যায়।

পরদিন সকালে সকলে আবিষ্কার করল, একটা খাদের পাশে এক রক্তাক্ত নারীদেহ। সমস্ত শাড়িটা তার ছিন্নভিন্ন। দেহের উপরের অংশ ব্লাউজহীন। সুতীক্ষ্ণ নখপ্রহারে জর্জরিত। কতকগুলি ক্ষুধার্ত দানব যেন তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। এ দৃশ্য চোখে দেখতেও ভয় করে!

পরে জানা গিয়েছিল, দেহটা লীলারই। আরো আশ্চর্য, তখনো লীলার দেহে প্রাণ ছিল।

অচৈতন্য অবস্থায় লীলাকে গ্যাস দিয়ে রাখা হয় হাসপাতালে। সে-ও প্রায় বারো ঘণ্টা। আজ সন্ধ্যা সাতটা ষোল মিনিটে লীলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

পুনশ্চ দিয়ে আরো একটু লেখা :

ফোন পাবার আগে লীলা যে চিঠিখানা আপনাকে লিখেছিল, ডাকে ফেলবার মতো করেই ঠিকানা লিখে আটা দিয়ে সে সেখানা এঁটে রেখে বেরিয়েছিল।··· সেটা পোস্ট করা হল।

টাটকা টাটকা উত্তর দেওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল—তার উত্তাপ আমার জীবনে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

মনে হল, এ খবর মা-ও এতক্ষণে নিশ্চয় পেয়েছেন। আর কী ভীষণ যে দুঃখিত হয়েছেন—সহজেই অনুমেয়!

মা দুঃখিত হলে যে, ইংলণ্ডের সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে!

অন্ধকার কি হয়নি এখনো?

'তুমি যদি সত্যিকার কবি হও, সহজেই কল্পনা করে নিতে পারবে এই অবস্থা।'

লীলার সুন্দর হস্তাক্ষরের পানে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েকটি অভিমত

মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—আপনার দু'খানি বই-ই পড়িয়াছি। খুব ভাল লাগিল। নূতন ধরনের লেখা। ২৮. ৮. ৫৭

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ইউনিভারসিটি অব লণ্ডন, লণ্ডন—অন্যান্য বিষয়কার্যে নিযুক্ত থেকেও বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলন যাঁরা করেছেন শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই মুষ্টিমেয় নেপথ্য সাধকদের অন্যতম। সাহিত্য-চর্চা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাল্য সংস্কার, পেশা না হলেও নেশা। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখে আমি তাঁর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই, লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সব্যসাচী ; গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁর সমান অধিকার। এ ছাড়া, অনুবাদ-কর্মেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয়-জ্ঞাপক রচনা আমি দেখেছি, ব্যঙ্গবিদ্রূপের হুল ফোটাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অদম্য অধ্যবসায় সর্বথা প্রশংসনীয়। আমি বাংলা সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ সাধকের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। ২৩. ৯. ৫৫

Dr. Tarapada Basu. M-Litt. (Cantab), D. Litt. (Paris). Foreign Correspondent & Representative, **'Hindusthan Standard,' 'Desh'** and **'Ananda Bazar Patrika'**, Fleet St. London, E. C. 4.—I read with great interest the 'Ripples' 'Naha Akaki' and some other Bengali books of Shri Madhusudan Chatterjee whom I met in London. He deserves great encouragement as his penmanship has a promising future. I wish him well. 6. 9. 55

Mr. Michael Curtis. Editor, News Chronicle, 12-22 Bouverie Street, London, E. C. 4—Dear Mr. Chatterjee : It was most kind of you to have given me a copy of your book of poems. I have read them with great interest, and feel sure that you must be proud of the fluency with which you have translated them from the original Bengali without losing their freshness or point.

Though I am afraid I cannot speak of Hoshi and the other Japanese poets, you have certainly achieved your aims with regard to Hafiz and Khayam, whose influence in them is unmistakable.

I congratulate you warmly on them, and hope that their success will encourage you to continue your efforts and perhaps even to venture your hand in a new poetic form. With all kind regards and good wishes. 12. 9. 55

আনন্দবাজার পত্রিকা—সংকলিতা। কবির স্বরচিত কবিতার একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে মৌলিক ও অনুবাদ উভয়বিধ কবিতাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু যেমন বহু বিচিত্র, তাহাদের ছন্দও তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিতাগুলি পাঠ করিতে গেলে সর্বাগ্রে যে বস্তুটির দ্বারা পাঠকচিত্ত প্রভাবিত হয়, তাহা হইল ছন্দের উপর লেখকের পরিপূর্ণ অধিকার। বিভিন্ন ধরনের ও বিচিত্র প্রকারের ছন্দ লইয়া তিনি এমন অবলীলাক্রমে খেলা করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন বিনা আয়াসে অন্তরের স্বাভাবিক আনন্দউৎস হইতে স্বচ্ছন্দে উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে।

'চৌপদী' শিরোনামায় বহু সংখ্যক কবিতা সজ্জিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতা চারি পংক্তিতে সম্পূর্ণ হইয়া এক একটি পৃথক ও পরিপূর্ণ ভাবকে ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছে। কবিতাগুলি ভাবের দিক দিয়া লঘু অথবা গুরু যাহাই হোক না কেন, ছন্দমাধুর্যে ও দ্যোতনার দিক হইতে তাহাদের প্রত্যেকটিই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

অনুবাদ কবিতাগুলি ভাষান্তরিত হইয়াছে জাপানী, পারসী ও

ইংরেজী প্রভৃতি কবিতা হইতে। যে কোন ভাষা হইতেই অনূদিত হোক না কেন—অনুবাদের আড়ষ্টতার দ্বারা তাহাদের গতিছন্দ কোথাও ব্যাহত বা বিড়ম্বিত হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সঙ্কলন গ্রন্থখানি কাব্যরসিক সমাজে সমাদৃত ও সম্বর্ধিত হইবে। ২০. ১০. ৫৭

দেশ—একশত তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় অনেকগুলো কবিতা ও গানের সমষ্টি। রচনাকাল ১৯৩২ থেকে ১৯৫৬ সাল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কবি কাব্য-রচনার যে অনুশীলন করেছেন, তার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে এ-কাব্যগ্রন্থে। ছন্দলালিত্যে, শব্দচয়নে প্রতিটি কবিতা সুন্দর। বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও বিচিত্র মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ৫. ১০. ৫৭

যুগান্তর—কবিতার বই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে ছাপা—হাতে ধরিলেই প্রথম বইখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মলাট হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইহার মুদ্রণপারিপাট্য লক্ষ্য করিবার মতো। কবিতাগুলি ভাববৈচিত্র্যে, রচনার আবেশে, ছন্দের মাধুর্যে মনোহর। বহু সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে ইহার বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। …কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারাও বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই বইয়ের কবিতাগুলি বিশেষভাবে উপভোগ করিতে পারিবেন। ৩০. ৬. ৫৭

বসুমতী—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখে আসছেন এবং খ্যাতিমানও হয়েছেন নিজের কৃতিত্বে।…নানা রসের নানা ছন্দের বিচিত্র ভাবগম্ভীর ও লঘু কবিতার এই স্তবকটি কাব্য-রসামোদীদের কাছে একটি উদ্দীপক উপঢৌকন হিসাবে গৃহীত হবে। ২৬. ৫. ৫৭

স্বাধীনতা—এই ধরনের একখানি মনোহর কাব্যসংকলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ২৯. ৯. ৫৭

শ্রীঅতুল্য ঘোষ, এম. পি.—সহ-সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি—'সংকলিতা' বইখানি পড়িয়া দেখিলাম। ভাষা ও শব্দের সহজ ও সরল অভিব্যক্তি এবং ছন্দের বৈচিত্র্যের জন্য কবিতাগুলি পাঠকদের সুখপাঠ্য হইবে বলিয়াই আশা করি। ১৫. ৫. ৫৯

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আপনার ইংরেজীতে লেখা 'Ripples'-এ আপনার যে কবিমনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, 'সংকলিতা'তে তা পূর্ণতা লাভ করেছে দেখে খুবই তৃপ্তি পেলাম। ইতিমধ্যে আপনি ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন ও সেখানকার বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে পরিচয়ে আপনার কাব্যপ্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করেছেন—তারও নিদর্শন আপনার কাব্যগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।...'দ্বিপ্রহরে', 'অলস হাওয়া', 'চাঁদ চলে যায়' প্রভৃতি কবিতা চিত্রকল্প-সঙ্গতিতে ও ভাবমায়ার আলোছায়া বিন্যাসে একেবারে প্রথম শ্রেণীর বলে আমার মনে হয়েছে...২. ৬. ৫৭

ডঃ রাজশেখর বসু—আপনি যা ভাবেন তা সাধারণের বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করবার শক্তি আপনার আছে। আপনি উংকপাল বা high-brow নন। ১৭. ৭. ৫৭

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—আপনার 'সংকলিতা'র কবিতাগুলি সুলিখিত ও সুগঠিত। বাঙালীর অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয় কিছু কিছু আছে। অনেক কবিতাতেই ক্ষমতার স্বকীয়তার চিহ্ন বিদ্যমান। আমি যে কবিতা-সংকলন বাহির করিয়াছি তন্মধ্যে আপনার কবিতা গৃহীত হইলে আমার সংকলনের মর্যাদাবৃদ্ধি হইত। ভবিষ্যতে ভুল সংশোধন করিয়া লইবার ইচ্ছা রহিল। ৬. ৬. ৫৭

শ্রীঅমল হোম—রোগশয্যায় যে বইগুলি পড়েছি ও পড়ে আনন্দ পেয়েছি—আপনার সংকলিতা তার মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। আপনার কবিতাগুলি আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে—তার অকপট সারল্যে, সার্থক অনুভূতিতে ও স্বচ্ছ প্রকাশে। আধুনিক বাংলা কবিতা—অডেন-ইলিয়ট-ইশারউডের ব্যর্থ অনুকরণে রচিত—আমার বিভীষিকা। আপনি তা থেকে মুক্ত করেছেন আমাকে। ১৭. ৭. ৫৭

অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. পি.—'সংকলিতা' আমার বেশ ভালো লেগেছে। ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যে, বিষয়-বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি রীতিমত আকর্ষণীয়। (নিউ দিল্লী) ১৫. ৯. ৫৭

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আপনার সংকলিতার ভাষা লাবণ্যময়ী, কবিতাগুলিও রসে নিটোল। আইডিওলজির রাক্ষস-পুরীর বাসিন্দে তারা নয়। আপনি অতি আধুনিক হয়েও যে আইডিওলজির বেনো জলের আক্রমণ থেকে নিজের মনটিকে বাঁচাতে পেরেছেন, এতে আপনাকে তারিফ করতেই হয়। কবিতা যে বুদ্ধির এলাকার বাসিন্দে নয়, প্রাণের এলাকায় তার ঘর, এই অতি সহজ কথাটা একালের সাহিত্যিকেরা ভুলতে চলেছে, তার ফলে যা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে অনাসৃষ্টি বলা ছাড়া উপায় নেই।

কবিতার বিষয় যা কিছু হতে পারে, কিন্তু কবিতাটি সার্থক সৃষ্টি হয়েছে কিনা তার বিচারে বিষয়ের বিচার একেবারেই অর্থহীন। সেটা রূপ পেলো কিনা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সেটি রূপবান হোলো কি হোলো না', এইটেই একমাত্র বিচার্য। কবিতাটিকে রূপবান হোতে হোলে বিষয়ের সত্তার সঙ্গে কবির সত্তার যে একাত্মতা-সাধন করতে হয় তাকে উপনিষদে 'সমাধি' বলেছেন। কবির সৃষ্টি-সাধনা সমাধি—এই কথা বলা হয়েছে। সমাধি মানে সত্তার দ্বারা অন্য সত্তার অবিমিশ্র আস্বাদলাভ। এই আস্বাদ পেলেই রস আসে, রস থেকে আসে আনন্দ, আনন্দ থেকে সৃষ্টি। একালে কবিতার বিষয়ের উপর যে এত বেশী ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে তার কারণ বিষয়ের অবান্তর কথা তুলে রূপহীন কবিতার রূপহীনতা থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে না নিলে নয়। বিষয়ের কারসাজি দিয়ে তাক লাগিয়ে কবিতার রূপহীনতাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা হচ্ছে আধুনিক কবিদের চেষ্টা। আমাদের একালের মতো এমন রূপহীন কাল বোধ হয় কখনো ছিলো না পৃথিবীতে। সৃষ্টির দিক থেকে এটা আকাল, কেননা রূপ ছাড়া তো সৃষ্টি নেই। (দার্জিলিং) ৩. ৬. ৫৭

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু—পরিচ্ছন্নতায় অপূর্ব এই বৃহৎ কবিতা-সংকলনখানি ছন্দমাধুর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। ৪. ৭. ৫৭

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—সংকলিতার কবিতাগুলি মন দিয়ে পড়লাম। বেশ ভালো লাগল। জোর করে নূতনত্ব করার কোন চেষ্টা নেই। অস্পষ্টতার গোলকধাঁধায় পথ হারায় না পাঠকেরা। আনন্দময় রসানুভূতির ছোঁয়া পাওয়া যায় প্রত্যেক কবিতাতেই। কবি মাত্রেরই জীবনদর্শনের একটা ক্রমপরিণতির ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের ধারাটি ধরতে না পারলে সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় না কবির। সেজন্যে

কবিজীবনের গোড়ার ধাপের লেখাগুলিরও একটা নিজস্ব দান আছে। তাই এই আনুপূর্বিক সংকলনটি সত্যিকার একটা সুচিন্তিত সংগ্রহ হয়েছে। ৮. ৯. ৫৮

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের 'সংকলিতা' পড়ে আনন্দ পেলাম। অনেকগুলি বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন জাতের কবিতা এতে সংগৃহীত হয়েছে। কবিতাগুলি নিশ্চয়ই বিভিন্ন বয়সের লেখা কিন্তু ক্রমপরিণতির লক্ষণ ছাড়া কবিতাগুলিতে একটি প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা আগাগোড়াই লক্ষণীয়। মধুসূদনবাবু কবিতা নিয়ে উদ্ভট কোন পরীক্ষার চেষ্টা করেননি। সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্যচেতনার অকৃত্রিম সারল্যই বর্তমান কাব্যজগতের নিরর্থক মাত্রাহীন বিপথবিলাসের মধ্যে একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ১২. ৮. ৫৭

শ্রীবিষ্ণু দে—আপনার সংকলিতার বিষয়ে অভিমত দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত কাজ। আমি বিনীত লোক। তবে, আপনি যে ঠিক কবিতা লেখা পেশা না করেও এত নিষ্ঠায় কবিতা লেখেন—এত বিচিত্র বিষয়ে ও বিচিত্র কাব্যরূপ নিয়ে তার জন্য আপনাকে তারিফ করতে হয়। ২৩. ৮. ৫৭

শ্রীরিরাম মুখোপাধ্যায়—কবিতার প্রতি আপনার অনুরাগ যে কত গভীর তার নিদর্শন সুশোভন 'সংকলিতা' কাব্যগ্রন্থখানি। বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দের চর্চাতেও আপনার সাবলীল কবিস্বভাব সুপরিস্ফুট।... আপনার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সত্যিই অনুকরণযোগ্য। ১২. ৯. ৫৭

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—আপনার প্রবাসকথা কাগজে দেখেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। আপনার সংকলিতার রিভিউও দেখেছি। বন্ধুত্ব-গৌরবে মনটা বিশেষ প্রসন্ন আছে। ১১. ১০. ৫৭

জরাসন্ধ—তোমার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। ১৯. ১. ৫৮

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়—সংকলিতার কবিতাগুলির মধ্যে কবির ছন্দমাধুর্য, ভাববৈচিত্র্য ও অন্তর্দৃষ্টি লক্ষণীয়। গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. ৬. ৫৭

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্যানফ্রান্সিস্কো ২৩, ক্যালিফোর্ণিয়া—আপনার রচনায় মননের পরিধি ও ভাবসমৃদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়েছি। ১২.৮.৫৭

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলিকাতা ২৭—আনন্দবাজারে আপনার লেখা পড়লাম। এ বিষয়ে আমাদের দেশে আলোচনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অনেক কথা জানা গেল। ৪.৬.৫৯

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য, এম. এ., কাব্যতীর্থ, সংস্কৃতি-সম্পাদক, 'সুরঙ্গমা'—'হে প্রিয়বান্ধবী'র গল্পগুলি পড়লাম। পরিপূর্ণ মানবিক আবেদনে ভরপুর। সুসমঞ্জস আঙ্গিকে সহৃদয়-সংবেদ্য। সাহিত্যের ভাঙা হাটে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে আসবে। এ আমার বিশ্বাস নয়—প্রত্যয়। ১৮.১১.৫৯

'জনসেবক' পত্রিকার শ্রীশান্তিকুমার মিত্রের সৌজন্যে দুটি ছবির ব্লক পাওয়া গিয়েছে। লেখক তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। লেখকের বন্ধু শ্রীসুনীল দাস নিঃস্বার্থ-ভাবে বইটির সৌকর্যসাধনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও বহু সাময়িক পত্রে এ বইয়ের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সংশ্লিষ্ট সম্পাদক মহোদয়গণকেও তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

এই লেখকের :

নহ একাকী
তোমারই হউক জয়
অগ্নি অভিষেক
তুমি কোথায়
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ
বেঙাচি
বাঁশির ডাক
হে প্রিয়বান্ধবী
সংকলিতা

ইংরেজী গ্রন্থ :

RIPPLES
(An English Translation of Author's
Bengali poems; published by
Thacker Spink & Co. (1933) Ltd.,
3 Esplanade East, Calcutta).